গল্পে

মহাকাব্য মহাভারত



গল্পে মহাকাব্য মহাভারত

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
সচিব
জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র,
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রাপ্তিস্থান ঃ
দি বুক ট্রাস্ট
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

নতুন সংস্করণ—১৯৮৮

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীস্বপন কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচী ও চিত্র-সূচী

॥ আদিপর্ব ॥

গঙ্গাদেবী যখন পুত্র দেবব্রতকে বিসর্জন দিচ্ছিলেন শান্তনু তখন বাধা দেন। এই পুত্রই পরবর্তী কালে ভীষ্ম।



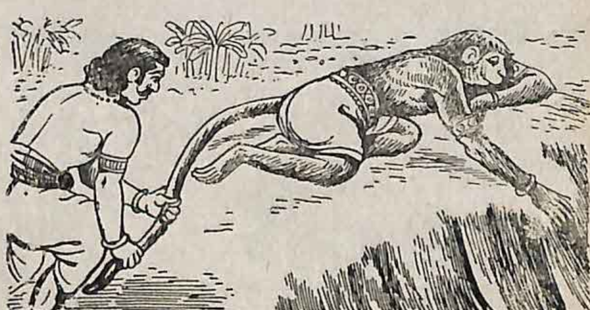
॥ সভাপর্ব ॥

শকুনি পাণ্ডবদের সাথে পণ রেখে পাশা খেলছেন।



॥ বনপর্ব ॥

হনুমান বানরের রূপ ধরে পথ আটকে শুয়ে আছেন। ভীম তাঁকে কিছুতেই সরাতে পারছেন না।



॥ বিরাটপর্ব ॥

ভীম কীচককে গলা টিপে বধ করছেন।



॥ উদ্যোগপর্ব ॥

কৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সাহায্য পাবার জন্য হাজির হয়েছেন অর্জুন আর দুর্যোধন।



॥ ভীষ্মপর্ব ॥

শিখণ্ডীকে দেখামাত্র ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করলেন; তখন অর্জুন বাণে বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করতে লাগলেন।



॥ দ্রোণপর্ব ॥

কর্ণের একাঘ্নী বাণে ঘটোৎকচের মৃত্যু।



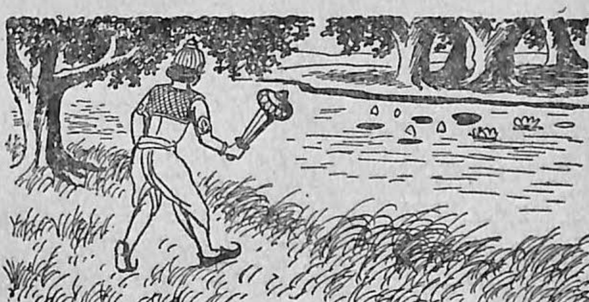
॥ কর্ণপর্ব ॥

অর্জুনের শরে মহাবীর কর্ণের মস্তক লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর।



॥ শল্যপর্ব ॥

দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে থাকা দুর্যোধনকে ভীম গদা হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।



॥ গদাপর্ব ॥

ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ।



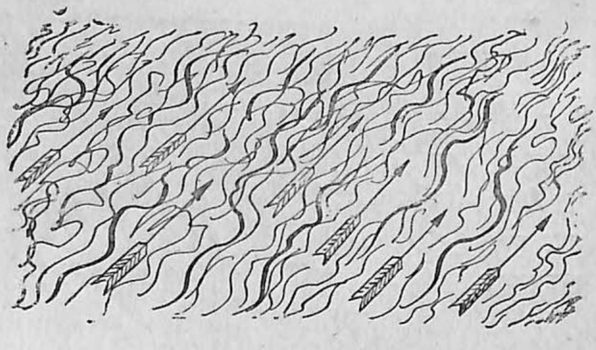
॥ সৌপ্তিকপর্ব ॥

অশ্বত্থামা অন্ধকারে ভুল করে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে পঞ্চ-পাণ্ডব ভেবে তাদের গলা কেটে মুণ্ডগুলি দুর্যোধনের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।



॥ ঐষিকপর্ব ॥

অশ্বত্থামার ঈষিকা অস্ত্র আর অর্জুনের সংবরণ অস্ত্র আকাশে উঠে অগ্নিবৃষ্টি করতে লাগল।



॥ স্ত্রীপর্ব ॥

ধৃতরাষ্ট্রের লৌহ-ভীম চূর্ণ।



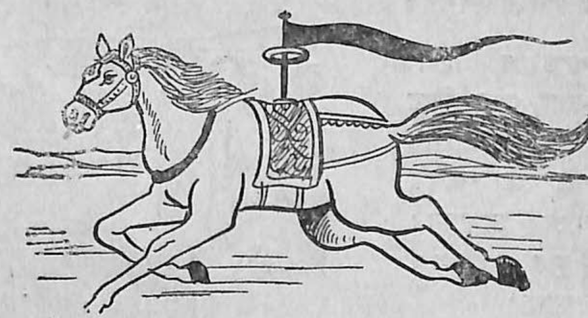
॥ শান্তিপর্ব ॥

পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যা।



॥ অশ্বমেধপর্ব ॥

পাণ্ডবদের অশ্ব-মেধ যজ্ঞের অশ্ব-ছুটে চলেছে।



॥ আশ্রমিকপর্ব ॥

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী বাকী জীবন তপস্যায় কাটাতে বনে চলে যাচ্ছেন।



॥ মুষলপর্ব ॥

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ।



॥ স্বর্গারোহণপর্ব ॥

পাণ্ডবগণ হিমালয়ের ওপর দিয়ে বহু দুর্গম পথ পার হয়ে স্বর্গের পথে চলেছেন। কুকুর পথ দেখাচ্ছে।



সূচনা

মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত লিখেছিলেন। তিনি ব্যাসদেব নামেই বেশী পরিচিত। আর বাংলাভাষায় মহাভারত লিখেছিলেন কাশীরাম দাস।

মহাভারত লেখা সম্পর্কে একটা সুন্দর গল্প আছে। ব্যাসদেব মহাভারত লিখবেন। কিন্তু এই বিরাট বই লিখবার যোগ্য মানুষ কোথায় পাবেন ?

নারদমুনির সঙ্গে বেদব্যাসের দেখা হোল। তিনি নারদকে সব কথা খুলে বললেন। তখন নারদমুনি বললেন, এ ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন গণেশ। তাঁর চারটি হাত। আর তাঁর সেই চারটি হাতই সমানভাবে চলে। তাঁর হাতের লেখাটাও খুব সুন্দর।

ব্যাসদেব এই কথা শুনে, গেলেন গণেশের সঙ্গে দেখা করতে। গণেশ বললেন, আমি লিখতে রাজী আছি। তবে একটা শর্ত—একটানা আপনাকে বলে যেতে হবে। এক মুহূর্তও থামলে চলবে না। যখনই থামবেন তখনই আমি লেখা ছেড়ে চলে যাবো।

ব্যাসদেব তাতেই রাজী হলেন। গণেশ তো চার হাতে কলম ধরে লিখতে বসলেন। দিনরাত অনর্গল ব্যাসদেব শ্লোক বলে যাচ্ছেন আর গণেশ লিখে যাচ্ছেন। এইভাবেই লেখা হয়েছিল অষ্টাদশপর্ব মহাভারত।

কথারম্ভ

বর্তমান দিল্লীর কাছে মহাভারতের কালে ছিল হস্তিনাপুর রাজ্য। সেখানে সে-সময় পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অর্জুনের

নাতি আর অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু ছিলেন তাঁর বাবা। এই পরীক্ষিৎ রাজা সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে জন্মেঞ্জয় সেই ক্রোধের বশে সমস্ত সাপ ধ্বংস করবার জন্যে সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। যজ্ঞের আগুনে লক্ষ লক্ষ সাপ পুড়ে মরতে লাগলো। শেষকালে আস্তিক মুনির অনুরোধে জন্মেঞ্জয় সাপহত্যা বন্ধ করলেন।

এরপর, প্রাণিহত্যা করার ফলে তাঁর যে পাপ হয়েছিল তা থেকে মুক্ত হবার জন্যে ব্যাসদেব জন্মেঞ্জয়কে মহাভারতের কাহিনী শুনতে বললেন। তখন ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনি তাঁকে মহাভারতের কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

আদিপর্ব

অনেক কাল আগেকার কথা। সে সময় হস্তিনাপুরে চন্দ্রবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। চন্দ্রবংশে বহু বড় বড় রাজা জন্মেছিলেন। সেই রাজাদের মধ্যে একজন ছিলেন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার ছেলে ভরত। তাঁর নাম অনুসারেই গোটা দেশটার নাম হয়েছিল ভারত বা ভারতবর্ষ।

এই চন্দ্রবংশেরই রাজা ছিলেন মহারাজ শান্তনু। গঙ্গাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তবে বিয়ের আগে গঙ্গাদেবী শান্তনুকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে, তিনি কোনোদিন গঙ্গাদেবীর কাজে বাধা দিতে পারবেন না। যেদিন বাধা দেবেন সেদিনই তিনি শান্তনুকে ছেড়ে চলে যাবেন। গঙ্গাদেবী এই শর্তে শান্তনুকে বিয়ে করেছিলেন। যাই হোক, বিয়ের পর তাঁদের পর পর সাতটি পুত্র জন্মায়। কিন্তু প্রতিবার সন্তান জন্মের পর গঙ্গাদেবী সন্তানটিকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতেন। এরপর তাঁদের অষ্টম পুত্র দেবব্রতের জন্ম হোল। কিন্তু শান্তনু এতদিন

গঙ্গার কাজে বাধা না দিলেও আর সহ্য করতে পারলেন না। দেবব্রতকে গঙ্গাদেবী যখন জলে ভাসিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন সেই সময় শান্তনু তাঁকে বাধা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আগেকার শর্ত অনুসারে গঙ্গাদেবী স্বর্গে চলে গেলেন। দেবব্রত ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলো। লেখাপড়া অস্ত্রবিদ্যা সকল বিষয়েই তার সামনে দাঁড়াতে পারে পৃথিবীতে এমন আর কেউ ছিল না। তখন মহারাজ শান্তনু রাজপুত্র দেবব্রতকে রাজ্যের যুবরাজ করলেন।

একদিন শান্তনু শিকার করতে গেছেন। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দাসরাজের মেয়ে সত্যবতীর। এমন তার অপূর্ব রূপ আর সৌন্দর্য যে, শান্তনু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সত্যবতীকে তিনি বিয়ে করতে চান। দাসরাজের কাছে অনুমতি চাইতে গেলেন। কিন্তু দাসরাজ বললেন, শান্তনুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁর আপত্তি নেই, তবে দুটি শর্ত আছে। তাঁর মেয়ে সত্যবতীকে পাটরানী করতে হবে আর রাজা করতে হবে তাঁরই মেয়ের ছেলেকে। কিন্তু দেবব্রতের মতো অমন গুণবান ছেলে থাকতে শান্তনু এরকম শর্তে কিছুতেই রাজী হতে পারলেন না। তাই হতাশমনে নিজের রাজ্যে ফিরে এসে মহাদুঃখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এদিকে দেবব্রত কয়েকদিন ধরে পিতার বিষণ্ন মুখ দেখে একটু আশ্চর্য হলেন। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা যখন জানতে পারলেন তখন দাসরাজকে গিয়ে বললেন, আপনি আমার পিতার হাতে আপনার মেয়েকে সমর্পণ করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি সত্যবতীর ছেলেই হস্তিনাপুরের রাজা হবে। আমি সিংহাসনের দাবি করবো না। দাসরাজ তখন বললেন, তুমি না হয় রাজ্যের দাবি ছেড়ে দিলে, কিন্তু তোমার ছেলে তো ছাড়বে না। তখন দেবব্রত আর এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলেন। বললেন, আমি কোনোদিন বিবাহ করব না। পিতার সুখের জন্যে নিজের সবকিছু ত্যাগ করে এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল ভীষ্ম। শান্তনুর সঙ্গে এরপর দাসরাজ-কন্যা সত্যবতীর বিয়ে হয়ে গেল। শান্তনু খুশী হয়ে পুত্র ভীষ্মকে দিলেন, 'ইচ্ছামৃত্যু' বর—অর্থাৎ নিজে ইচ্ছা না করলে কেউ তাঁকে মারতে পারবে না!

শান্তনু মারা যাবার পর সত্যবতীর ছেলে বিচিত্রবীর্য হস্তিনাপুরের

রাজা হলেন। বিচিত্রবীর্যের দুই ছেলে—একজনের নাম ধৃতরাষ্ট্র, অপরজনের নাম পাণ্ডু। বড় ছেলে ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন বলে তার ছোট ভাই পাণ্ডু রাজা হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর এবং পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তী ও মাদ্রীর বিয়ে দিয়েছিলেন ভীষ্ম।

একে একে পাণ্ডুর পাঁচটি পুত্র হোল। কুন্তীর তিন ছেলে—যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন। আর মাদ্রীর দুই ছেলে—নকুল ও সহদেব। ধর্মের বরে যুধিষ্ঠির, পবনের বরে ভীম, ইন্দ্রের বরে অর্জুন আর দুই অশ্বিনীকুমারের বরে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়েছিল। এছাড়া বিবাহের আগে সূর্যের বরে কুন্তীর আর এক পুত্র জন্মেছিল, তার নাম কর্ণ। কুন্তী তাকে একটি তাম্রপাত্রে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অধিরথ সারথি ও তার স্ত্রী রাধা তাকে জল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেছিলেন। ক্রমে এই কর্ণ বড় হয়ে একজন খুব বড় দাতা এবং বীর হয়ে উঠেছিলেন।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—পাণ্ডুর এই পাঁচ ছেলেকে বলা হোত পাণ্ডব। আর ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত ছেলে ছিল, তাঁদের বলা হোত কৌরব।

ছেলেরা ছোট থাকতেই পাণ্ডু মারা গেলেন। তখন পিতামহ ভীষ্ম তাঁর নাবালক ছেলেদের দেখাশোনা করতে লাগলেন। আর পাণ্ডবদের পক্ষে রাজ্য চালাতে লাগলেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবদের সঙ্গেই মানুষ হতে লাগলেন। ভীষ্ম এঁদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার জন্যে প্রথমে কৃপাচার্য এবং তারপর দ্রোণাচার্যকে নিযুক্ত করলেন।

ছেলেবেলা থেকেই কৌরবরা পাণ্ডবদের খুব হিংসা করতেন। তাঁদের সব থেকে বেশী রাগ ছিল ভীমের ওপর। কারণ, ভীমের সঙ্গে গায়ের জোরে কৌরবরা কেউ পেরে উঠতেন না। সেইজন্যে একবার দুর্যোধন ভীমকে মেরে ফেলার জন্যে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র করলেন। খেলা করতে গিয়ে চক্রান্ত করে ভীমকে বিষ খাইয়ে নদীর জলে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। ভীমের ভাগ্য নেহাত ভাল ছিল। তাই তিনি জলের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে পাতালে নাগরাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বড়

বড় সাপগুলো ভীমকে একা পেয়ে খুব দংশন করতে লাগলো! এতে ভীমের অবশ্য ভালই হোল। সাপের বিষে ভীমের দেহের বিষ কেটে গেল। ভীমের যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন তিনি এমনভাবে সাপগুলোকে মারতে লাগলেন যে, সারা নাগরাজ্যে ভীষণ হুলুস্থুল পড়ে গেল।

এই সংবাদ পাবামাত্র নাগরাজ বাসুকি ছুটে এলেন। তিনি ভীমের পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হলেন। আসলে বাসুকি ছিলেন আটজন বসুরই একজন। ভীষ্ম তাঁর ভাই। ঋষির শাপে মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আছেন। সেই ভীষ্মের নাতি ভীম, সুতরাং সম্পর্কে তাঁরও নাতি। তাই ভীমকে তিনি খুব আদরযত্ন করলেন, তারপর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। ভীমকে মারবার জন্যে দুর্যোধন যে কুমতলব করেছিলেন তা সফল হোল না।

এদিকে দ্রোণাচার্যের শিষ্যদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা শেষ হয়ে এলো। অস্ত্রবিদ্যায় সকলের সেরা হয়ে উঠলেন অর্জুন। একদিন, শিষ্যরা কেমন অস্ত্রবিদ্যা শিখেছে দেখবার জন্যে গাছের ওপর একটা কাঠের পাখী রেখে তার মাথা কাটবার জন্যে শিষ্যদের প্রস্তুত হতে বললেন দ্রোণাচার্য। তারপর প্রথমে যুধিষ্ঠিরের হাতে তীর-ধনুক দিয়ে তিনি তাঁকে 'কি দেখছো' জিজ্ঞাসা করলেন। যুধিষ্ঠির তখন উত্তর দিলেন, তিনি গাছে পাখী ও নীচে অন্য সকলকে দেখতে পাচ্ছেন। দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তীর-ধনুক তাঁর হাত থেকে নিয়ে একে একে কৌরব ও পাণ্ডবদের সকলকে এইভাবে পরীক্ষা করলেন। এরপর এলো অর্জুনের পালা। অর্জুনকে 'কি দেখছো' জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন জানালেন, তিনি দুটি চোখ সহ পাখীটির মাথাটাই মাত্র দেখতে পাচ্ছেন। গুরু দ্রোণাচার্য আদেশ দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই অর্জুন পাখীর মাথাটা কেটে ফেললেন। অর্জুনের ওপর খুব খুশী হলেন দ্রোণাচার্য।

রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র একদিন তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। পরীক্ষার দিন রঙ্গভূমি লোকে লোকারণ্য। ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন। রাজপুত্রেরা নানারকম অস্ত্রের কসরত দেখাতে লাগলেন। তারপর গুরু

হোল অর্জুনের তীর-ধনুকের খেলা। চারিদিকে বাণের মায়াজাল সৃষ্টি করলেন অর্জুন। অর্জুনের নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

ঠিক এমন সময় রঙ্গভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন মহাবীর কর্ণ। তাঁর কানে ছিল জন্মসময়ে সূর্যের দেওয়া কুণ্ডল আর গলায় কবচ। কুন্তী ছাড়া আর কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না। কর্ণ এসেই অর্জুনকে তার সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষায় আহ্বান করলেন। দুর্যোধনের তো খুব আনন্দ। তিনি কর্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন। অর্জুনকে এবার জব্দ করা যাবে। কর্ণের এমন ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে অর্জুন যুদ্ধ করবার জন্য তৈরি হলেন। দু'জনের যুদ্ধ বাধার উপক্রম দেখে কৃপাচার্য এসে কর্ণকে বললেন, সমানে সমানে যুদ্ধ করাই নিয়ম। অর্জুন রাজপুত্র। কিন্তু কর্ণের পরিচয় কি? কর্ণ নিজের পরিচয় জানতেন। সারথি অধিরথ আর তাঁর স্ত্রী রাধাকে তিনি নিজের পিতামাতা বলেই জানতেন। সুতরাং আপনার পরিচয় দিতে না পেরে লজ্জায় মাথা নত করলেন।

ঠিক সেই সময় দুর্যোধন এসে কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান করে তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। এইদিন থেকে দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

যুধিষ্ঠির ছিলেন কুরুকুলে সকলের বড়। সেইজন্যে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে কুরুরাজ্যের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন। রাজ্যসুদ্ধ লোক পাণ্ডবদের প্রশংসা করে। চারিদিকে তাঁদের প্রশংসা শুনতে-শুনতে দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবদের সঙ্গে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও মনে খুব হিংসা জাগলো। তাই তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে পাণ্ডবদের দূরে কোথাও সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ঠিক করলেন পাণ্ডব ও তাঁদের মা কুন্তীকে বারণাবতে পাঠিয়ে দেবেন।

এদিকে দুর্যোধন করলেন আর এক কুমতলব। তিনি বারণাবতে পাণ্ডবদের থাকবার জন্যে একটা 'জতুগৃহ' তৈরী করালেন। ঘি, গালা, চর্বি, শণ, বাঁশ প্রভৃতি যে সব জিনিস সহজেই পুড়ে যায় এমন জিনিস দিয়ে তৈরি ঘরকে বলে 'জতুগৃহ'। একবার যদি সে-ঘরে আগুন লাগে তাহলে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে। আর তখন সকলকেই পুড়ে মরতে হবে।

বারণাবতে গিয়েই পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের কুমতলব বুঝতে পারলেন। তখন তাঁরা একজন খনককে দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করিয়ে নিলেন। তারপর একদিন রাতে নিজেরাই ঘরে আগুন লাগিয়ে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গেলেন। গোটা বাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। ঘরে আগুন লাগিয়ে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্যে সেখানে ছিলেন দুর্যোধনের মন্ত্রী পুরোচন। আর সেদিন রাতে একটা ব্যাধের মেয়ে তার পাঁচটি ছেলেকে নিয়ে জতুগৃহের বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিল। সেই আগুনে সকলেই তারা পুড়ে মরল। লোকে সেই ব্যাধের মেয়েটি ও তার পাঁচ ছেলের পোড়া মৃতদেহ দেখে ভাবলে, কুন্তী এবং পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই মারা গেছেন। সকলেই হায়-হায় করে কেঁদে উঠলো। এদিকে পাণ্ডবরা তখন পাঁচ ভাই মাকে নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে অনেক দূর চলে গেছেন।

হাঁটতে-হাঁটতে তারা এসে হাজির হলেন হিড়িম্ব রাক্ষসের বনে। সকলেই তখন এত ক্লান্ত এবং পিপাসায় কাতর যে, আর পথ চলতে পারছেন না। তখন ভীম সকলকে একটা বটগাছের নীচে বিশ্রাম করতে বলে জল আনতে গেলেন। কিন্তু জল নিয়ে এসে তিনি দেখলেন, সকলে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কী আর করেন ভীম! তাঁদের ঘুম ভাঙাতে তাঁর ইচ্ছা হোল না। জল নিয়ে বসে রইলেন সেইখানেই।

এদিকে হিড়িম্ব রাক্ষস মানুষের গন্ধ পেয়ে তাঁদের ধরে আনতে বোন হিড়িম্বাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু হিড়িম্বা ভীমের রূপ আর অমন সুন্দর চেহারা দেখে মোহিত হয়ে, নিজে মায়ার দ্বারা অপূর্ব সুন্দরী সেজে, ভীমের সামনে এসে হাজির হোল। সে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, ভীমকে সে বিয়ে করতে চায়।

এদিকে হিড়িম্বার আসতে দেরি দেখে হিড়িম্ব রাক্ষস সেখানে এসে হাজির হোল। ভীম সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হিড়িম্ব প্রথমে তাঁকেই খাবার জন্যে যেই তেড়ে এসেছে অমনি ভীম তাকে জাপটে ধরলেন। তারপর শুরু হোল ভীষণ যুদ্ধ। হিড়িম্বর চীৎকারে সমস্ত বন কেঁপে উঠলো। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর হিড়িম্বর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে আছাড় দিলেন ভীম। তারপর তাকে পায়ে চেপে মেরে ফেললেন।

হিড়িম্ব আর ভীমের চীৎকারে কুন্তী আর তাঁর চার ভাইয়ের ঘুম ভেঙে গেছে। হিড়িম্বা সেই সময় কুন্তীর কাছে গিয়ে তার মনের ইচ্ছার কথা জানালো। হিড়িম্বার কাতর অনুরোধে কুন্তীদেবীর মন নরম হোল। শেষপর্যন্ত মায়ের কথায় ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করলেন। এরপর তাঁরা বনে-বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিছুকাল পর ঘটোৎকচ নামে হিড়িম্বার এক মহাবলশালী পুত্র হোল। যখন তাদের স্মরণ করা হবে তখনই তারা এসে হাজির হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘটোৎকচকে নিয়ে হিড়িম্বা আপন রাজ্যে চলে গেল।

এরপর পান্ডবরা সন্ন্যাসী সেজে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে একদিন একচক্র নগরে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। পাঁচ ভাই ব্রাহ্মণের বেশে মা কুন্তীকে নিয়ে সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকলেন! পাঁচ ভাই ভিক্ষা করে আনেন, সন্ধ্যাবেলায় কুন্তীদেবী রান্না করে অর্ধেক ভীমকে খেতে দেন, বাকী অর্ধেক আর-সকলে ভাগ করে খান। এইভাবেই দিন চলতে লাগলো।

চার ভাই একদিন ভিক্ষায় বের হয়েছেন ; ভীম আছেন বাড়িতে মায়ের কাছে। এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ-বাড়িতে হঠাৎ কান্নার রোল উঠলো। কি ব্যাপার ? খোঁজ নিয়ে কুন্তীদেবী জানতে পারলেন, সেই রাজ্যে 'বক' নামে একটি রাক্ষস বাস করে। রোজ তার জন্যে প্রত্যেক বাড়ি থেকে পালা করে একজন লোক আর গাড়ি-গাড়ি খাবার পাঠাতে হয়। আগামী-কাল তাদের পালা। সেইজন্যেই ব্রাহ্মণী কাঁদছেন। তাঁর ছেলে বা স্বামী যাকে হোক একজনকে রাক্ষসের হাতে মরতে হবে।

কুন্তীদেবী সব কথা শুনে বললেন, আপনারা কাঁদবেন না। আমার পাঁচ ছেলে আছে, তাদের মধ্যে একজন যাবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই সে-কথায় রাজী নন। কারণ তাঁরা যে তাঁর অতিথি। তখন কুন্তীদেবী বললেন, ভাববেন না, আমার ছেলে ভীম যাবে। সে যে-সে ছেলে নয়। সে একাই বক রাক্ষসের মানুষ খাওয়ার শখ চিরকালের মতো মিটিয়ে দেবে। অগত্যা ব্রাহ্মণ রাজী হলেন।

সকালবেলায় ভীম গাড়ি-গাড়ি খাবার নিয়ে গিয়ে নিজেই টপাটপ

সে-সব খেয়ে শেষ করলেন। একেই পেঁছোতে অনেক দেরি হয়ে গেছে ভীমের। খিদেয় ছটফট করছে বেচারা। তার উপর আবার ভীমের এমন ব্যবহার! রেগে আগুন হয়ে গেল বক। হুংকার দিয়ে বললে, আমার খাবার কোথায়? ভীম হাসতে হাসতে বললে, আমি সব খেয়ে ফেলেছি। তখন ভীষণ রেগে ভীমকে খাবার জন্যে তেড়ে এলো বক রাক্ষস। সঙ্গে সঙ্গে ভীম একটা বিরাট গাছ উপড়ে নিয়ে তার মাথায় এমন আঘাত করল যে, বেচারা চোখ কপালে তুলে মরে গেল। পরদিন বক রাক্ষসের মৃতদেহ দেখে সকলেই খুব আনন্দিত হোল।

এদিকে আর এক ঘটনা। দ্রুপদ হলেন পাঞ্চাল দেশের রাজা। তাঁর মেয়ে দ্রৌপদী। তার মতো সুন্দরী তখনকার দিনে আর কেউ ছিলেন না। সেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হবে। স্বয়ম্বর সভায় এসে উপস্থিত হয়েছেন দেশ-বিদেশের রাজারা। এসেছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবরা। খবর শুনে, পাণ্ডবরাও উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণের বেশে।

স্বয়ম্বর সভা শুরু হোল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর বোন দ্রৌপদীকে নিয়ে স্বয়ম্বর সভায় হাজির হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজাদের ডেকে বললেন, এই ধনু আর পাঁচটা বাণ রইলো। উপরে চাকা ঘুরছে। চাকার ওপরে আছে সোনার মাছ। নীচে জলে তার ছায়া পড়েছে। জলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে যিনি চাকার ছিদ্রপথে তীর মেরে মাছের চোখ বিঁধতে পারবেন, দ্রৌপদী তাঁরই গলায় মালা দেবেন।

লক্ষ্য বিঁধবার জন্যে রাজাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু কেউ লক্ষ্য বিঁধতে পারলেন না। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন জলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে এক বাণেই মাছের চোখ বিঁধলেন। রাজারা কিন্তু তাতে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তখন অর্জুন আর এক বাণে মাছের মাথাটা কেটে ফেললেন। দ্রৌপদী সঙ্গে সঙ্গে হাতে মালা নিয়ে অর্জুনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। অর্জুনের গলায় পরিয়ে দিলেন সেই মালা।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে হাজির হলেন সেই ব্রাহ্মণের কুটিরে। ভীম কুন্তীকে ডেকে বললেন, মা, দেখ, আমরা আজ ভিক্ষায় কী পেয়েছি? কুন্তী ছিলেন ঘরের মধ্যে। তিনি

না দেখেই উত্তর দিলেন, যা পেয়েছ তা পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করে নাও। মায়ের কথা মিথ্যা হবার নয়। সুতরাং পাঁচ ভাই-এর সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে হয়ে গেল।

দ্রুপদ রাজা এখন পাণ্ডবদের পরিচয় জানতে পেরেছেন। তিনি আদর করে তাঁদের ডেকে নিয়ে গেলেন।

কৌরবরা এতদিন খুব আনন্দেই ছিলেন। ভেবেছিলেন, পাণ্ডবরা জতুগৃহে পুড়ে মারা গেছেন। কিন্তু এখনো বেঁচে আছেন জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন বিদুর ভীষ্ম প্রভৃতিকে ডেকে পরামর্শ করতে বসলেন। তাঁরা সকলেই অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের দিয়ে দিতে পরামর্শ দিলেন। কি আর করেন ধৃতরাষ্ট্র! পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে নিয়ে আসবার জন্যে বিদুরকে পাঠানো হোল। ঠিক হোল, এখন থেকে পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে থাকবেন।

পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই হস্তিনাপুরে এসে উপস্থিত হলেন। রাজ্যের লোকের আনন্দ আর ধরে না। তারপর তাঁরা খাণ্ডবপ্রস্থে অর্ধেক রাজ্য পেয়ে চলে গেলেন। অনেক প্রজাও চলে গেল তাঁদের সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই খাণ্ডবপ্রস্থ খুব জমজমাট হয়ে উঠলো। পাণ্ডবরা সেখানে একটা রাজধানী তৈরি করলেন। সেটি ইন্দ্রের অমরাবতীর থেকেও সুন্দর। সেইজন্যে কৃষ্ণ তার নাম রাখলেন ইন্দ্রপ্রস্থ। ক্রমে পাঁচ ভাই-এর বীরত্ব আর গুণের কথা লোকের মুখে প্রচারিত হতে লাগলো।

সভাপর্ব

সেকালে ময়দানব নামে একজন খুব বড় শিল্পী ছিলেন। বিশ্বকর্মা যেমন দেবতাদের শিল্পী ময়দানব তেমনি দানবদের শিল্পী। অগ্নিদেব যখন খাণ্ডববন পোড়াচ্ছিলেন সেই সময় পশু-পক্ষী দৈত্য-দানব সব পুড়ে মরে

যায়। কিন্তু ময়দানবকে অর্জুন বাঁচিয়ে ছিলেন। সেইজন্যে তিনি অর্জুনের কোনো একটা কাজ করে দিতে চান। ময়দানব কিছুতেই ছাড়বেন না, কিছু একটা করবেনই। অগত্যা অর্জুন তাঁকে কৃষ্ণের কাছে পাঠালেন, বললেন, দেখুন, কৃষ্ণ যদি কিছু করতে বলেন।

কৃষ্ণ ময়দানবের সমস্ত কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে, আপনি যুধিষ্ঠিরের এমন একটা রাজসভা তৈরী করে দিন যার মতো সুন্দর সভা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে দেখা যাবে না। ময়দানব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সভা তৈরী করলেন, ত্রিভুবনে যার জুড়ি নেই। মণিমুক্তা খচিত বিশাল সভা, স্ফটিকের বেদী, স্তম্ভ। মাঝে মাঝে মণিমুক্তা বসানো। সমস্ত সভাটা ঝলমল করছে। সারোবরের মাঝখানে আর একটা সরোবর, মনে হয় যেন আয়না বিছানো আছে। চারিদিকের বসবার জায়গাগুলোও মণি-মুক্তা বসানো। ঘরে ঘরে মণিমুক্তার ঝাড় ঝুলছে। আলোয় আলোময় চারিদিক।

এই রাজসভা দেখতে ছুটে এলেন মুনি, ঋষি ও নানান দেশের রাজারা। স্বর্গ থেকে এলেন দেবতারা। সকলেই যুধিষ্ঠিরের রাজসভা দেখে প্রশংসা করতে লাগলেন। এমন সময় একদিন স্বর্গ থেকে নারদমুনি এসে হাজির হলেন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায়। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, স্বর্গে পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে আদেশ করেছেন। এই যজ্ঞ করতে হলে সব দেশের রাজাকে যুদ্ধে হারাতে হবে, তাঁদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হবে। তাই মহাভাবনায় পড়লেন যুধিষ্ঠির। এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে; সেইজন্যে কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠালেন তিনি।

তারপর কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব বের হলেন দিগ্বিজয়ে। চারিদিক জয় করে, রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে, ফিরে এলেন চার ভাই। কত ধনরত্ন মণিমুক্তা যে তাঁরা আনলেন তার সীমা-পরিসীমা রইলো না। এবার ধুমধাম করে রাজসূয় যজ্ঞের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসে যজ্ঞের ভার নিলেন। দেশ-বিদেশের রাজাদের নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হোল। স্বর্গে দেবতাদের নিমন্ত্রণ করতে গেলেন অর্জুন নিজে। হস্তিনাপুরে গিয়ে ভীষ্ম,

দ্রোণ, বিদুর, দুর্যোধন প্রভৃতিকে নিয়ে এলেন নকুল। খুব জাঁকজমক করে যজ্ঞ শেষ হোল। চারিদিকে পড়ে গেল পাণ্ডবদের জয়-জয়কার।

পাণ্ডবদের এরকম উন্নতি দেখে কৌরব হিংসায় জ্বলে মরতে লাগলেন। এসব একেবারে সহ্য হবার নয়। কিভাবে পাণ্ডবদের জব্দ করা যায় সেই সম্বন্ধে শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন দুর্যোদন। শকুনির একটা পাশা ছিল। শকুনি যা বলতো পাশা তাই শুনতো। শকুনি সেইজন্যে দুর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় নিমন্ত্রণ করতে। তিনি পান্ডবদের সর্বস্ব জিতে নেবেন কপট পাশাখেলায়।

ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে রাজী হননি। তারপর দুর্যোধনের জেদের জন্য রাজী হতে বাধ্য হলেন এবং বিদুরকে পাঠালেন পাশাখেলার নিমন্ত্রণ করতে। সেকালে ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ অথবা পাশাখেলায় আমন্ত্রণ জানালে সে-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। পাণ্ডবরা বুঝতে পারলেন এই পাশা-খেলার পিছনে দুর্যোধনের নিশ্চয় একটা কু-মতলব আছে। কিন্তু তবুও তাদের হস্তিনাপুরে যেতে হোল।

কপট পাশাখেলায় প্রত্যেকবারই শকুনি জয়লাভ করতে লাগলো। যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় একে একে ধনরত্ন, রাজ্যসম্পদ, এমনকি নিজেদের এবং দ্রৌপদীকেও বাজি রেখে হারলেন। যুধিষ্ঠির তখন সর্বনাশের নেশায় উন্মত্ত। তিনি পাণ্ডবদের সকলকে দাসদের সঙ্গে বসালেন। রাজরাণী দ্রৌপদী এখন কৌরবদের দাসী। তাই দুর্যোধন তাদের আরো অপমান করবার জন্যে দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন—এখনই দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে রাজসভায় টেনে আনো।

আদেশ পাওয়ামাত্র দুঃশাসন রাজকুলবধূ দ্রৌপদীকে রাজসভায় টেনে এনে বললো—তুমি এখন আমাদের দাসী। তোমাকে আমরা যা বলবো তাই করতে হবে। দুর্যোধন আদেশ দিলেন—দ্রৌপদীর বস্ত্র কেড়ে নাও। সঙ্গে সঙ্গে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাপড় ধরে টানতে লাগলো। কাতরকণ্ঠে দ্রৌপদী সকলের কাছে বিচার প্রার্থনা করলেন। কিন্তু সকলেই দুর্যোধনের ভয়ে চুপ। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ কেউ কোনো কথা বললেন না। তখন আর কোনো উপায় না দেখে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক

অবাক কাণ্ড। দুঃশাসন যতই কাপড় ধরে টানে ততই তার হাতে কাপড় স্তূপাকার হয়ে উঠতে লাগলো। শেষকালে দুঃশাসন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো।

ভীম সেই সময় সভার মাঝখানে প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করবেন, আর দুর্যোধনের ঊরু ভেঙে দেবেন। দ্রৌপদীও প্রতিজ্ঞা করলেন, যে দুঃশাসন আমার চুলে হাত দিয়েছে—তার বুকের রক্ত এই চুলে না মেখে আমি বেণী বাঁধবো না।

ভীমের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি ভয়ে কেঁপে উঠলেন। ধৃতরাষ্ট্রও ভয় পেয়েছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি রাজসভায় গিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন—মা, তুমি কুরুকুলের বধূ। আমার ছেলেরা তোমাকে অপমান করে নিজেদেরই অপমান করেছে। তুমি তাদের ক্ষমা করো মা। আমার কাছে তোমার যা ইচ্ছা সেই বর চাও।

দ্রৌপদী তখন বললেন—আপনি আমার স্বামীদের অস্ত্রশস্ত্র সহ মুক্তি দিন। আর এই বর দিন, আমার ছেলেদের যেন কেউ 'দাসীপুত্র' না বলে।

ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের মুক্তি দেওয়া হোল। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন।

দুর্যোধন আবার কেঁদে পড়লেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। বললেন—পিতা, এবার আর আমাদের রক্ষা নেই। ভীম কি প্রতিজ্ঞা করে গেছে শুনেছেন তো? আপনি ওদের ছেড়ে দিলেন। এবার নিশ্চয় আমরা মারা পড়বো।

ধৃতরাষ্ট্র দেখলেন, দুর্যোধনের কথাই ঠিক। তাই ঠিক হোল আবার পাশাখেলা হবে। এবার বাজি থাকবে বারো বছর বনবাস, আর একবছর অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের সময় তাদের খুঁজে বের করতে পারলে আবার বারো বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাস। ধৃতরাষ্ট্র আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আমন্ত্রণ জানালেন।

আবার নতুন করে পাশাখেলা হোল। শকুনি মহাধূর্ত। কপট পাশায় এবারেও তিনি পাণ্ডবদের হারিয়ে দিলেন। কৌরবরা টিটকারি দিতে লাগলেন পাণ্ডবদের।

এরপর পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে চলে গেলেন। কেবলমাত্র কুন্তীদেবী বুড়ী হয়েছেন বলে তিনি রইলেন বিদুরের কাছে।

কিছুদিন পর ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় নারদ এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন—এখন থেকে চৌদ্দ বছর পরে কুরু-পাণ্ডবে শুরু হবে এক মহাযুদ্ধ। সে যুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই মহাযুদ্ধে কৃষ্ণ হবেন পাণ্ডবদের সহায়।

এইভাবে কুরুবংশ ধ্বংসের সূচনা হোল।

বনপর্ব

পাশাখেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে চললেন। বহু ব্রাহ্মণ আর প্রজাও তাদের সঙ্গে চললেন। পঞ্চপাণ্ডবকে ছেড়ে তাঁরা থাকতে পারবেন না। যুধিষ্ঠির তাঁদের অনেক বোঝালেন কিন্তু কেউ তাঁদের ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না। যুধিষ্ঠির মহাচিন্তায় পড়লেন। এতগুলো লোককে খাওয়াবেন কি? উপায় না দেখে তিনি সূর্যের পূজা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব বর দিলেন, দ্রৌপদী অল্প একটু রান্না করলেই তা আর ফুরাবে না। পৃথিবীসুদ্ধ লোককে খাওয়ানো চলবে সেই খাবারে। তবে দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গেলে আর কিছুই থাকবে না। যাই হোক, আপাতত খাওয়াবার সমস্যা মিটল। যুধিষ্ঠিরের আর চিন্তা রইল না।

এরপর পাণ্ডবরা বহু বন ঘুরে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে পাণ্ডবদের বনবাসের কথা। নানা দেশের বড় বড় রাজারা এলেন যুধিষ্ঠরের সঙ্গে দেখা করতে। বনে থাকলেও রাজা ও ব্রাহ্মণরা সর্বদা যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণও একদিন দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, তোমরা চিন্তা করো না, দুষ্ট দুর্যোধন

তার কুকর্মের ফল অবশ্যই পাবে। শ্রীকৃষ্ণ আর রাজারা চলে গেলেন। এরপর কাম্যকবন থেকে পাণ্ডবরা গেলেন দ্বৈতবনে।

বনবাসে থাকা ভীমের একেবারে পছন্দ হচ্ছিল না। তার ইচ্ছা যুদ্ধ করে তারা শত্রুদের শাস্তি দেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির বোঝালেন এত অধৈর্য হওয়া উচিত নয়। কারণ ওদের শক্তিটাও তো কম নয়। ওদের দলে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ এবং কৃপাচার্যের মত বীররা রয়েছেন।

ঠিক সেই সময় একদিন ব্যাসদেব পাণ্ডবদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন—এই মন্ত্রের বলে অর্জুন দেবতাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাবে, আর অর্জুনের মতো বীরও কেউ থাকবে না।

এরপর অর্জুন গেলেন হিমালয়ে। সেখানে মহাদেবের স্তব করে লাভ করলেন 'পাশুপাত' অস্ত্র। তারপর একে একে ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা এসে অর্জুনকে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র দিলেন। এখন দেবতা ও মানুষের মধ্যে অর্জুনের সমান বীর আর কেউ নেই। তখন ইন্দ্র স্বর্গের নিবাতকবচ দৈত্যকে বধ করবার জন্য অর্জুনকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। সেখানেও তিনি দেবতাদের কাছ থেকে যে কত অস্ত্রশস্ত্র পেলেন তা আর বলে শেষ করা যায়না। এদিকে অর্জুনের স্বর্গে খ্যাতিলাভের কথা, সাহস ও বীরত্বের কথা এবং অস্ত্রশস্ত্রলাভের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের ঘুম ছুটে গেল। তিনি বুঝলেন অর্জুনের হাত থেকে কৌরবদের আর রক্ষা নেই।

নিবাত কবচকে বধ করে ফিরে আসবার সময় স্বর্গের উর্বশী অর্জুনকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু অর্জুন রাজী না হওয়ায় উর্বশী অভিশাপ দিলেন—তুমি একবছর নারী হয়ে থাকবে। ইন্দ্র এই অভিশাপের কথা শুনে খুশী হয়ে অর্জুনকে বললেন—এই অভিশাপ তোমার পক্ষে খুব ভালই হোল। অজ্ঞাতবাসের সময় যদি নারীরূপে থাক তাহলে কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না।

এদিকে অর্জুন অনেক দিন তপস্যায় গেছেন। পাণ্ডবরা কেবল অর্জুনের কথা চিন্তা করেন। এমন সময় লোমশ মুনি এসে অর্জুনের

খবর দিলেন। যাই হোক, অর্জুনের খবর পেয়ে তাঁরা আনন্দে নানা তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে আবার কাম্যকবনে ফিরে এলেন।

একদিন হঠাৎ একটা সুগন্ধ পেয়ে তাঁরা লোমশ মুনিকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন লোমশ মুনি বললেন, উত্তরদিকে আছে গন্ধমাদন পর্বত। সেখানে কুবেরের সরোবরে অসংখ্য সোনার পদ্মফুল ফুটে আছে। তাঁর অনুচর যক্ষেরা সেটা দিনরাত পাহারা দিচ্ছে। এ গন্ধ সেই সোনার পদ্মের গন্ধ।

সোনার পদ্মের কথা শোনা মাত্রই দ্রৌপদী ভীমকে বললেন—একশো আটটা সোনার পদ্ম এনে দিতে। তিনি সেই পদ্ম দিয়ে পূজা করবেন। ভীম অমনি ছুটলেন গন্ধমাদন পর্বতের দিকে। পথে রামচন্দ্রের অনুচর হনুমানের কলাবন দেখতে পেলেন ভীম। তিনি পেটভরে কলা খেয়ে গাছপালা ভেঙে তছনছ করলেন। হনুমান তো অবাক। তাঁর কলাবন ভাঙার সাহস দেবতাদের নেই। কে তবে এমন দুঃসাহস করলো? হনুমান চললেন তাকে শাস্তি দিতে। দূর থেকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন ভীমকে। তাঁরা দু'জনেই পবনের ছেলে। এ যে তাঁর ছোট ভাই ভীম। তাঁর ভাই না হলে এমন সাহস আর কার হতে পারে!

যাই হোক, তবুও মজা করার জন্যে হনুমান একটা বুড়ো বানরের রূপ ধরে পথের ওপর শুয়ে থাকলেন। সরু পথ, তাঁকে না সরিয়ে যাওয়া যায় না। ভীম তখন তাঁকে সরে যেতে বললেন। হনুমান ছল করে বললেন—আমি বুড়ো হয়েছি, আমার আর নড়বার শক্তি নেই, আমাকে সরিয়ে রেখে চলে যাও। ভীম কিছুতেই তাঁকে নড়াতে পারলেন না। তাঁর কপাল দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরতে লাগলো। তখন ভীম জোড়হাত করে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। পরিচয় পেয়ে হনুমানকে প্রণাম করে বললেন—আপনি আমার দাদা, যা কুকর্ম আমি করেছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। হনুমান তখন বললেন—তোমার পরিচয় আমি আগেই জেনেছি, ক্ষমাও করেছি অনেক আগে। এই বলে হনুমান খুশী হয়ে ভীমকে পথ ছেড়ে দিলেন!

ভীম এরপর সরোবরে পদ্মফুল তুলতে গেলেন। অমনি কুবেরের লক্ষ

লক্ষ অনুচর যক্ষ তাঁকে তেড়ে এলো। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এক-একটা গাছ উপড়ে ভীম যক্ষদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। বহু যক্ষ মারা গেল তাঁর হাতে। খবর পেয়ে কুবের ছুটে এলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডবরাও ভীমের খোঁজে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। যাই হোক, কুবের পাণ্ডবদের পরিচয় পেয়ে খুশী মনে তাঁদের পদ্মফুল তুলতে দিলেন। ভীম আর তাঁর ভাইয়েরা তখন একশো আটটা পদ্মফুল তুলে নিয়ে ফিরে গেলেন।

ওদিকে দুর্যোধন কিন্তু পাণ্ডবদের অনিষ্ট করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। একদিন দুর্বাসা শিষ্যদের নিয়ে দুর্যোধনের গৃহে হাজির হলেন। এই দুর্বাসা ছিলেন ভয়ানক বদরাগী ঋষি। তিনি সামান্য কারণেই ভয়ংকর অভিশাপ দিতেন। তাই দেবতারাও তাঁকে ভয় করে চলতেন। যাই হোক, দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যদের খুব সেবাযত্ব করলেন দুর্যোধন। খুশী হয়ে দুর্যোধনকে বর দিতে চাইলেন দুর্বাসা। তখন দুর্যোধন বললেন—প্রভু, একদিন রাত্রে দ্রৌপদীর আহারের পর আপনি তার অতিথি হবেন, আমাকে এই বর দিন।

দুর্যোধনের কথায় রাজী হয়ে গেলেন দুর্বাসা। দুর্যোধন ভাবলেন, এই দার্বাসার অভিশাপে পাণ্ডব বংশ নিশ্চয় ধ্বংস হবে।

কথামাত্র হঠাৎ একদিন রাত্রে দুর্বাসা দশ হাজার শিষ্য নিয়ে পাণ্ডবদের আস্তানায় এসে হাজির হলেন। বললেন—আমাদের খাওয়ার আয়োজন কর। আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। এখনি নদী থেকে স্নান করে আসছি।

দুর্বাসার মতো ঋষি এমন অসময়ে এসে হাজির! মহাবিপদ! কি করবেন পাণ্ডবরা কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। দ্রৌপদীরও খাওয়া হয়ে গেছে। তখন দ্রৌপদী আকুল হয়ে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। ভক্তের ডাক শুনে কৃষ্ণ ছুটে এসেছেন। এসেই বললেন, বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।

দ্রৌপদী তখন বললে—দুর্বাসা এসে আমার কাছে খাবার চেয়ে এক বিপদে ফেলেছেন, সঙ্গে দশ হাজার শিষ্য। সেই বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যেই তোমাকে ডাকলাম, আর তুমিও পরিহাস করছো আমাকে? কৃষ্ণ কোনো কথাই শুনতে চান না। বললেন—দেখোনা তোমার হাঁড়িতে কি

আছে। দ্রৌপদী হাঁড়ি আনতে কৃষ্ণ দেখলেন হাঁড়ির এক কোণে একটু শাক আর ভাত রয়েছে। সেইটুকু মুখে দিয়ে তিনি পরম তৃপ্তিতে ঢেকুর তুললেন। বললেন—বিশ্বাত্মা তৃপ্ত হোক!

ওদিকে দুর্বাসা শিষ্যদের নিয়ে স্নান সেরে উঠলেন। দেখলেন পেট ভর্তি। খাওয়ার ইচ্ছা একটুও নেই। ঢেকুরের পর ঢেকুর উঠছে। দুর্বাসা তখন শিষ্যদের নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। এইভাবে কৃষ্ণের দয়ায় একটা বড় বিপদ কেটে গেল।

বারো বছর প্রায় শেষ হয়ে এলো। পাণ্ডবরা তখন কাম্যকবন ছেড়ে শূরসেনবনে গেলেন। একদিন ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে পাণ্ডবদের। কাছাকাছি কোথাও জল নেই। ভীম জল আনবার জন্যে গেলেন।

এদিকে পাণ্ডবদের পরীক্ষা করবার জন্যে ধর্ম বকের রূপ ধরে সেখানে বসে ছিলেন। তিনি ভীমকে বললেম—মধ্যপাণ্ডব, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তবে তুমি জল পান কর। না বলে জল স্পর্শ করামাত্র তোমার মৃত্যু হবে। একটা বকের কথা আর কে গ্রাহ্য করে? কোনো জবাব না দিয়েই ভীম জল স্পর্শ করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হোল।

ভীমের আসতে দেরী দেখে একে একে অর্জুন, নকুল, সহদেব এলেন সরোবরে। কিন্তু বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় তাঁরা সকলেই মারা গেলেন। কেউই ফিরছেন না দেখে ব্যাকুল হয়ে যুধিষ্ঠির এবার নিজেই তাঁদের খুঁজতে এলেন। এসে দেখেন, সরোবরের তীরে বসে আছে একটি বক আর পড়ে আছে চার ভাইয়ের মৃতদেহ। বক তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, দেখেছ, আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জল খেতে গিয়ে তোমার ভাইদের কি অবস্থা হয়েছে। আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে যদি জলে নামো তাহলে তোমারও ওই একই অবস্থা হবে। যুধিষ্ঠির তখন বিনীতভাবে বললেন, বেশ আপনি প্রশ্ন করুন। আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।

বক তখন যুধিষ্ঠিকে চারটি প্রশ্ন করলেন—

এক ॥ কথা কি?

দুই ॥ সব থেকে আশ্চর্য কি?

তিন ॥ পথ কোন্‌টা ?

চার ॥ সুখী বলা যায় কাকে ?

তখন যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—মানুষ মোহের মধ্যে এই সংসারে ডুবে আছে। অথচ, কাল অনন্ত। তার শেষ নেই। সে নিজের নিয়মেই চলবে। এই হোল কথা।

সব থেকে আশ্চর্য হোল - মানুষ প্রত্যেকদিন নিজের চোখের সামনে কত মানুষকে মরতে দেখেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মারামারি করে ! সে একবারও ভাবে না, তাকেও একদিন মরতে হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনার তৃতীয় প্রশ্ন, 'পথ কোন্‌টা ?' তার উত্তরে বলবো, অনেক রকম শাস্ত্র আছে, অনেক মুনির অনেক রকম মত। সেইজন্যে মহৎ মানুষেরা যে পথে চলেন সেইটাকেই প্রকৃত পথ বলা উচিত। আর আপনার চতুর্থ বা শেষ প্রশ্নের উত্তর, যিনি নিজের বাড়িতে থাকেন, যাঁর ঋণ নেই, যদি একবেলা শাক-ভাত জোটে তবুও তিনি সুখী।

যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনে ধর্মরূপী বক খুব খুশী হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তোমার ভাইদের মধ্যে একজনকে আমি বাঁচিয়ে দেবো ! তুমি কাকে চাও, বল। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, আমার মায়ের এক ছেলে আমি বেঁচে আছি। আপনি আমার বিমাতার ছেলে সহদেবকে দয়া করে বাঁচিয়ে দিন। ধর্ম তখন খুশী হয়ে সকলকেই বাঁচিয়ে দিলেন এবং বর দিলেন অজ্ঞাতবাসের সময় কেউ তাঁদের চিনতে পারবে না।

এদিকে বনবাসের সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। বারো বছর শেষ হতে আর বাকী আছে মাত্র ছ'দিন।

বিরাটপর্ব

অজ্ঞাতবাসের সময়টা কাটাবার জন্যে মুনিঋষি আর ব্রাহ্মণদের বিদায় দিয়ে পাণ্ডবরা মৎস্যদেশে এসে পেঁছলেন। সেখানে একটা শমীগাছের

ওপরে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বেঁধে রেখে ছদ্মবেশ ধারণ করে বিরাট রাজার রাজসভায় আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে 'কঙ্ক' নাম নিয়ে বিরাটের রাজসভায় সভাসদ হলেন। অর্জুন 'বৃহন্নলা' নাম ধারণ করলেন এবং অন্তঃপুরে রাজকন্যা উত্তরাকে নাচগান শেখানোর দায়িত্ব নিলেন। ভীম 'বল্লভ' নাম নিয়ে রন্ধনশালার দায়িত্ব পেলেন। দ্রৌপদী বিরাটরাজার রাণীর বেশভূষা আর চুল বাঁধার কাজ পেলেন। তাঁর নাম হোল 'সৈরিন্ধ্রী'। নকুল ও সহদেব 'গ্রন্থিক' আর 'তন্ত্রিপাল' নাম নিয়ে বিরাটরাজার গোশালা ও অশ্বশালার রক্ষক হলেন।

অজ্ঞাতবাসের দিনগুলো পাণ্ডবদের ভালভাবেই কাটছিলো। এইভাবে এগারো মাস কেটে গেছে। আর মাত্র একমাস বাকী। এমন সময় গণ্ডগোল বাধালো রাজার শ্যালক ও সেনাপতি কীচক। কীচক ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও শয়তান প্রকৃতির। আশপাশের রাজারাও তার ভয়ে সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকতো।

দ্রৌপদীকে দেখতে পেলেই কীচক তাঁকে অপমান করতো। তার ভয়ে একদিন দ্রোপদী রাজসভায় ছুটে এলেন। কীচকও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বিরাটরাজার সামনে তাঁর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে লাথি মারলো। বিরাট রাজা ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না। রান্নাঘরে ভীমকে গিয়ে দ্রৌপদী এই সংবাদ দিলেন। আর সেই রাত্রেই কীচককে বধ করলেন ভীম।

কীচকের ছিল একশো ভাই। তারা ভাবল, এ নিশ্চয় দ্রৌপদীর গন্ধর্ব স্বামীদের কাজ। কারণ তিনি আগেই বিরাটরাজার রাণীকে জানিয়ে ছিলেন তাঁর পাঁচজন গন্ধর্ব স্বামী আছেন। সেইজন্যে কীচকের শবদেহ পোড়াতে নিয়ে যাবার সময় দ্রৌপদীকে তারা বেঁধে নিয়ে গেল। তারা ঠিক করলো, কীচকের সঙ্গে দ্রৌপদীকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

কিন্তু দ্রৌপদীর কান্না শুনে ভীম গোপনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড একটা গাছের আঘাতে সেই একশো ভাইকে মেরে ফেললেন। রাজবাড়িতে কান্নার রোল উঠলো। তখন রাণী সুদেষ্ণা কিছুতেই আর দ্রৌপদীকে থাকতে দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু তাঁর পাঁচজন গন্ধর্ব

স্বামীর ভয়ে দ্রৌপদীর কথামত মাত্র তেরো দিন থাকবার অনুমতি দিলেন। কারণ, তাঁদের অজ্ঞাতবাসের মাত্র আর তেরো দিন বাকী ছিল।

এদিকে কীচক মারা গেছেন শুনে দুর্যোধন গোধন চুরি করার জন্য বিরাটরাজার রাজ্য আক্রমণ করলেন। বিরাটরাজা কুরুসৈন্যদের বাধা দেবার জন্যে সৈন্য নিয়ে রাজ্যের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধে বিরাট-রাজার পরাজয় হোল। সুশর্মা বিরাটরাজাকে বেঁধে নিয়ে চললো। তখন যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম সুশর্মাকে বন্দী করে বিরাটকে মুক্ত করলেন।

এদিকে বিরাটরাজার অনুপস্থিতির সুযোগে দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি বীরদের সঙ্গে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তরদিক আক্রমণ করে বিরাট রাজার ষাট লক্ষ গরু কেড়ে নিলেন। রাজবাড়িতে তখন রাজপুত্র উত্তর ছিলেন। তিনি নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই বাড়িতে ছিলেন।

উত্তর বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে বললেন, একজন সারথি পেলে আমি এখনই সমস্ত কৌরব সৈন্যকে হারিয়ে গরুগুলো কেড়ে আনতে পারতাম। বৃহন্নলা সঙ্গে সঙ্গে তাকে রথে চাপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু বিরাট কুরুসৈন্য দেখেই রাজপুত্র উত্তর ভয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়েই ছুটতে আরম্ভ করলেন।

তখন বৃহন্নলা উত্তরকে নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, তুমি যেন কাউকে একথা বোলো না। এই বলে উত্তরকে রথের সারথি করে অর্জুন শমীগাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেড়ে নিয়ে স্ত্রীবেশ ত্যাগ করে কুরুসৈন্যদের আক্রমণ করলেন।

শুরু হোল ভয়ংকর যুদ্ধ। শেষকালে অর্জুন সম্মোহন-বাণ মেরে সকলকে অজ্ঞান করে দিলেন। তারপর দুযোধন, কর্ণ প্রভৃতির পোশাক-গুলো খুলে নিলেন উত্তরার পুতুলের পোশাক করার জন্যে। জ্ঞান ফিরে এলে নিজেদের দুর্দশা দেখে দুর্যোধন খুব লজ্জা পেলেন এবং সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। অর্জুনের অনুরোধে উত্তর যুদ্ধে জয়লাভের আসল কারণটা কাউকে বললেন না। সকলেই মনে করলো, উত্তরই যুদ্ধ জয় করেছে।

এদিকে অজ্ঞাতবাসের দিন শেষ হয়ে গেছে। পাণ্ডবরা বিরাটরাজাকে

তাঁদের পরিচয় দিলেন। তখন বিরাটরাজা না জেনে যে সমস্ত অপরাধ পাণ্ডবদের কাছে করেছেন তার জন্যে ক্ষমা চাইলেন। আর অর্জুনের সঙ্গে রাজকন্য উত্তরার বিয়ে দিতে চাইলেন।

কিন্তু অর্জুন একথায় রাজী হতে পারলেন না। তিনি যে উত্তরার গুরু। সুতরাং উত্তরা তাঁর মেয়ের মতো। তাই অর্জুন বললেন যে তিনি তাঁর ছেলে অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে দেবেন। এ প্রস্তাবে যুধিষ্ঠিরও রাজী হলেন। দ্বারকায় সঙ্গে সঙ্গে রথ পাঠানো হোল। অভিমন্যু তখন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছিলেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অভিমন্যুকে নিয়ে বিরাটরাজার রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তারপর এক শুভদিনে অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ হয়ে গেল।

উদ্যোগপর্ব

অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহের পর শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং পাণ্ডবদের অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী কিভাবে পাণ্ডবরা রাজ্য ফিরে পেতে পারেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের বারো বছর বনবাস এবং একবছর অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, পুরোহিত ধৌম্যকে দুর্যোধনের কাছে পাঠাও। তাহলে তার মনোভাবটা জানতে পারা যাবে। কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠিরের পরামর্শদাতা ধৌম্য হস্তিনাপুরে গিয়ে দুর্যোধনকে বললেন, পাণ্ডবদের বারো বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে। সুতরাং ইন্দ্রপ্রস্থ এখন তাঁদের ফিরিয়ে দিন।

দুর্যোধন তো ধৌম্যর কথা শুনে হেসেই অস্থির। বললেন, দেখুন, সুচের আগায় যেটুকু জমি ধরে, বিনাযুদ্ধে সেটুকুও আমি পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দেবো না। ধৌম্য ফিরে এসে যখন পাণ্ডবদের কাছে এ সংবাদ

জানালেন তখন পাণ্ডবরা বুঝলেন যুদ্ধ ছাড়া অন্য উপায় নেই। হস্তিনাপুরে দুর্যোধনও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

কুন্তী যখন বুঝলেন, এ যুদ্ধ বাধবেই তখন তিনি কৃষ্ণকে পাঠালেন কর্ণের কাছে। কৃষ্ণ বললেন, দেখ কর্ণ, তুমি পাণ্ডবদের বড় ভাই। বড় ভাই হিসাবে তুমিই রাজা হওয়ার যোগ্য। পাণ্ডবরা তোমাকে সমাদরে রাজসিংহাসনে বসিয়ে তোমার সেবা করবে। তুমি দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান কর। কর্ণ উত্তর দিলেন, তা কি করে সম্ভব কৃষ্ণ? তুমি তো জানো, আমার অসময়ে দুর্যোধন আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমাকে অঙ্গরাজ্যের রাজা করেছিলেন। আজ দুর্যোধনের দুঃসময়ে রাজ্যের লোভে আমি তাঁকে ছেড়ে যেতে পারবো না।

কৃষ্ণের মুখে কর্ণের এই কথা শুনে কুন্তী আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি নিজেই গেলেন কর্ণের কাছে। কর্ণ তখন নদীতীরে সূর্যপূজা করছিলেন। কুন্তীকে দেখে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন কর্ণ। জানতে পারলেন, ইনিই তাঁর গর্ভধারিণী জননী। কর্ণ বললেন, মা, আমি তো কৃষ্ণকে সব কথা খুলে বলে দিয়েছি। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, অর্জুন ছাড়া আপনার আর কোরো ছেলেকে আমি যুদ্ধে বধ করবো না। সুতরাং এই যুদ্ধে আমি বা অর্জুন মরলেও আপনার পাঁচটি ছেলে যেমন আছে তেমনই থাকবে। কী আর করেন কুন্তী! এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েই তাঁকে কর্ণের কাছ থেকে চলে আসতে হোল।

দু'পক্ষেই এদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। সেকালে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নিয়ম ছিল, প্রথমে যে যার পক্ষে বরণ করতো, সে শত্রু বা মিত্র যাই হোক, তার পক্ষেই যোগ দিতে হোত। দেশে দেশে দূত পাঠানো হচ্ছে রাজাদের কাছে। বড় বড় বীরকে নিজেদের দলে টানার জন্য দু'পক্ষই চেষ্টা করছেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে পাঠালেন কৃষ্ণকে নিজেদের পক্ষে পাবার জন্য, আর দুর্যোধন নিজেই হাজির হলেন দ্বারকায়।

তাঁরা যখন পৌঁছোলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ ঘুমিয়ে ছিলেন। অর্জুন বসলেন কৃষ্ণের পায়ের কাছে। দুর্যোধন বসলেন কৃষ্ণের মাথার কাছে। ঘুম ভাঙতে প্রথমেই তিনি অর্জুনকে দেখতে পেলেন, ত্যরপর দুর্যোধনকে দেখলেন।

তাই বললেন, অর্জুনকে প্রথমে দেখেছেন অতএব তিনি অর্জুনের পক্ষেই থাকবেন। তবে তিনি যুদ্ধ করবেন না—অর্জুনের রথের সারথি হবেন। আর দুর্যোধনকে পরে দেখেছিলেন। সেইজন্যে দুর্যোধনকে দিলেন তাঁর অসংখ্য নারায়ণী-সেনা।

দুর্যোধন একা কৃষ্ণ অপেক্ষা অসংখ্য নারায়ণী-সেনা বেশী পছন্দ করলেন। সেইজন্য আনন্দিত মনে তিনি হস্তিনায় ফিরে গেলেন।

দু'পক্ষেই যোগ দেবার জন্যে দেখতে দেখতে সৈন্যসহ রাজারা আসতে লাগলেন। পাণ্ডবদের দিকে বিরাট, চেদিরাজ, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, জয়সেন প্রভৃতি রাজা শিবির ফেলতে লাগলেন। আর দুর্যোধনের পক্ষে শিবির স্থাপন করলেন জয়দ্রথ, কৃতবর্মা, শল্য, ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি রাজা। এমনিভাবে কৌরবপক্ষে এগারো অক্ষৌহিণী আর পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য হোল।

তারপর দুর্যোধনের সভায় শেষ চেষ্টা করতে গেলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দুর্যোধনকে বললেন, দেখ, যুদ্ধে শুধু শুধু লোকক্ষয় করো না, তুমি পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইকে পাঁচখানি গ্রাম দাও। কিন্তু দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ কানেই নিলেন না।

কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে যুদ্ধের জন্যে মুখোমুখি দাঁড়ালো দুই দল। দুর্যোধনকে কথা দিলেন ভীষ্ম, তিনি দশ দিন সেনাপতি থেকে প্রতিদিন দশ হাজার করে শত্রুসৈন্য ও অনেক রথীকে বধ করবেন। দ্রোণ বললেন, সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্য বধ করতে তাঁর এক মাস সময় লাগবে। কৃপাচার্য বললেন, তাঁর সময় লাগবে দু'মাস। অশ্বত্থামা বললেন, পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষ করতে তাঁর দশ দিনের বেশী সময় লাগবে না। কর্ণ বললেন, তিনি মাত্র পাঁচ দিনেই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বধ করতে পারেন। কর্ণের এই অহংকার শুনে পিতামহ ভীষ্ম হেসে বললেন, তুমি মহারথী নও, অর্ধরথী মাত্র। মহারথীদের সামনে ও-ধরনের কথা বলা তোমার উচিত নয়। একথায় কর্ণ রেগে গিয়ে বললেন, যতদিন ভীষ্ম সেনাপতি আছেন ততদিন তিনি অস্ত্র-ধারণ করবেন না।

এদিকে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতদিনে কুরুসৈন্য

ধ্বংস করতে পার? অর্জুন বললেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি সহায় থাকেন তাহলে আমি এক মুহূর্তেই সমস্ত কৌরবসৈন্য ধ্বংস করতে পারি।

ব্যাসদেব শেষবারের মতো এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। কিন্তু কিছুতেই তিনি এ যুদ্ধ থেকে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তখন তিনি সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করলেন—যাতে হস্তিনাপুরে বসেই যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে পারেন এবং অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে তা শোনাতে পারেন।

ভীষ্মপর্ব

মহাযুদ্ধ শুরু হবে। কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে কৌরব এবং পাণ্ডব দু'পক্ষেই হস্তী, অশ্ব, রথ আর পদাতিক বাহিনী শুধুমাত্র আদেশের অপেক্ষা করছে। কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি হলেন পিতামহ ভীষ্ম। যুদ্ধের আগে দু'পক্ষই কতকগুলো নিয়ম ঠিক করে নিয়েছিলেন, কেউ যদি অস্ত্রহীন হন অথবা আহত হন তাহলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা চলবে না। সবল আক্রমণ করবে না দুর্বলকে। যদি যুদ্ধ করতে করতে কেউ অস্ত্র ত্যাগ করেন তাহলে তাঁর সঙ্গে আর যুদ্ধ করা চলবে না।

সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে দু'পক্ষের সৈন্যরাই গদা, বর্শা, ভল্ল, শল্য, খড়্গ, তীর-ধনুক প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। কৌরবপক্ষের সৈন্যদের পরিচালনা করছিলেন ভীষ্ম। এমন সময় পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যসজ্জা দেখতে এলেন অর্জুন। রথ ঘর্ঘর শব্দে এগিয়ে এলো। অর্জুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলেন, বিপক্ষে সমবেত হয়েছেন গুরু দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, শল্য, দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং আরও অনেকে। দু'পক্ষেই রয়েছেন নিজেরই আত্মীয়-স্বজন, ভাই, বন্ধু, প্রিয়জন। এ দৃশ্য দেখে ভীষণ বৈরাগ্য এলো অর্জুনের মনে। ভাবতে লাগলেন, মানুষ

রাজ্য চায় কেন? আত্মীয়-স্বজনকে সুখে রাখবে, প্রজাদের কল্যাণ করবে সেই জন্যেই তো। কিন্তু রাজ্যলাভের জন্যে যদি তাঁদের মেরে ফেলতে হয় তাহলে সে-রাজ্য নিয়ে কি লাভ? তাই তিনি তীর-ধনুক নামিয়ে রথের উপর বসে পড়লেন। বললেন, আমি যুদ্ধ করবো না।

শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে নানারকম উপদেশ দিতে লাগলেন। এই উপদেশকেই 'গীতা' বলা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার কর্তব্য ধর্মযুদ্ধ করা, অন্যায়ের প্রতিকার করা। আত্মীয় হলেও অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা উচিত নয়। স্বধর্মে মৃত্যুও ভাল, পরধর্ম ভয়াবহ। অন্যায়ের সামনে মাথা নীচু করা ক্লীবত্ব; সুতরাং তুমি ক্লীব হয়ো না—যুদ্ধ কর। ফলাফলের কথা চিন্তা না করে তুমি কাজ করে যাও। আর মৃত্যুর কথা কেন চিন্তা করছ? আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না। কেউ তোমাকে হত্যা করতে পারে না, তুমিও কাউকে হত্যা করতে পার না। আত্মাকে অস্ত্রে কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলেও ডোবে না। মানুষ যেমন পুরনো জীর্ণ বস্ত্র ছেড়ে নতুন বস্ত্র পরে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখালেন বিশ্বরূপ—মোহ ভঙ্গ হল অর্জুনের।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে প্রণাম করলেন যুধিষ্ঠির। তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'জয়ী হও'।

এবার ভীষ্ম শাঁখ বাজিয়ে দিলেন যুদ্ধ আরম্ভের। শাঁখ বেজে উঠলো পাণ্ডবপক্ষেও।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রথের চাকার ঘর্ঘর ধ্বনি, অশ্বক্ষুরের শব্দ, তরবারির ঝনঝন, হস্তীর বৃংহতী নাদ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। পাণ্ডবপক্ষে ভীম, অর্জুন প্রভৃতি বীর এবং কৌরবপক্ষে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, ভগদত্ত প্রভৃতি বীর ভীষণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। প্রতিদিন উভয় পক্ষেরই হাজার হাজার সৈন্য ধ্বংস হতে লাগলো। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, ভীষ্ম যেন ততই পাণ্ডবদের কাছে ভীষণ ভয়ের

কারণ হয়ে উঠছেন। প্রতিদিন তিনি একাই দশহাজার করে পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করছেন। অষ্টম আর নবম দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবরা আর তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। স্বয়ং অর্জুনও ভীষ্মের কাছে বারংবার হেরে যেতে লাগলেন।

নবম দিনের যুদ্ধশেষে পাণ্ডবরা পরামর্শ করতে বসলেন, এখন উপায় কী? ভীষ্ম বেঁচে থাকতে পাণ্ডবদের জিতবার কোনো আশাই নেই। তখন কৃষ্ণ বললেন—দেখো, ভীষ্ম তোমাদের সব থেকে বেশী ভালবাসেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্যই তাঁকে এই যুদ্ধ করতে হচ্ছে। সুতরাং এবিষয়ে তাঁরই পরামর্শ নেওয়া সব থেকে ভাল।

শ্রীকৃষ্ণের কথামত, গভীর রাত্রে পাণ্ডবরা পাঁচভাই কৃষ্ণকে নিয়ে ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হলেন। ভীষ্মকে তাঁরা প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমরা যুদ্ধে জয়ী হও'।

যুধিষ্ঠির তখন বললেন, 'পিতামহ, আপনি যেভাবে পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করছেন তাতে আমাদের আর জয়ের আশা কোথায়!'

ভীষ্ম একটু হেসে বললেন, 'তা ঠিকই। আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের জয়ের কোনো আশা নেই। তবে দ্রুপদ রাজার ছেলে শিখণ্ডী—সে ছিল গতজন্মে একজন মেয়ে। তার নাম ছিল অম্বা। সে আমাকে বধ করবে বলে তপস্যা করে প্রাণত্যাগ করে। এ জন্মে শিখণ্ডী হয়ে জন্মেছে। এ জন্মে সে মেয়েও নয়, ছেলেও নয়। আমার প্রতিজ্ঞা আছে, সে আমার সামনে দাঁড়ালে—আমি যুদ্ধ করবো না, আর অস্ত্র ত্যাগ করে পালিয়েও যাবো না। আমার এরকম প্রতিজ্ঞা থাকায়, সে সময় ইচ্ছা করলে অর্জুন আমাকে বধ করতে পারবে।'

ভীষ্মের নিকট থেকে তাঁর মৃত্যুর উপায় জেনে নিয়ে পাণ্ডবরা নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন।

দশম দিনে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার দু'পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হোল। অর্জুন প্রথম থেকেই এমন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে, কৌরব-সৈন্যরা তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। দুর্যোধন ভয় পেয়ে গেলেন।

তখন ভীষ্ম তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এমন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে, অর্জুন তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না। পাণ্ডবরা আর কোনো উপায় না দেখে শিখণ্ডীকে এনে অর্জুনের রথের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সম্মুখে শিখণ্ডীকে দেখামাত্র ভীষ্ম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অর্জুন তখন বাণে বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করতে লাগলেন! ভীষ্ম শেষ সময় বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। তারপর সূর্যাস্তের আগেই রথ থেকে তাঁর দেহটি মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু তীরগুলো এমন এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছিল যে, তাঁর দেহ মাটিতে ঠেকলো না—শরশয্যায় তিনি শুয়ে রইলেন।

সকলে তখন যুদ্ধ বন্ধ করে ছুটে এলেন পিতামহের কাছে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে। তিনি একটা বালিশ চাইলেন। দুর্যোধন তাড়াতাড়ি একটা ভালো বালিশ নিয়ে এলেন। তখন ভীষ্ম বললেন, 'শরশয্যায় কি এই বালিশ কেউ মাথায় দেয়?' অর্জুন বুঝতে পেরে তিনটি বাণ মেরে তাঁর মাথা রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর একটু খাবার জল চাইলেন ভীষ্ম। দুর্যোধন সোনার পাত্রে জল আনলেন। ভীষ্ম সে জল পান না করে অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন তখন বাণ মেরে পাতাল থেকে গঙ্গার জল ফোয়ারার মত এনে দিলেন। ভীষ্ম সেই জল পান করলেন।

কিন্তু এত শরের আঘাতেও ভীষ্মের মৃত্যু হয়নি। কারণ তিনি ইচ্ছা না করলে তাঁর মৃত্যু হবে না। তিনি বললেন, 'সূর্য যখন আকাশের উত্তরদিকে যাবেন—সেই উত্তরায়ণের পুণ্যসময়ে আমি প্রাণত্যাগ করবো।'

তারপর তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের অনেক উপদেশ দিলেন। দুর্যোধনকেও তিনি যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলতে এবং পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু দুর্যোধন সে কথা শুনলেন না।

ভীষ্মের পতনের পর সকলেই বুঝতে পারলেন, কৌরবদের ধ্বংস অনিবার্য।

দ্রোণপর্ব

ভীষ্মের পতনের পর কৌরবদের সেনাপতি হলেন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। তিনি সেনাপতি হয়ে ভীষণ যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তবুও কৌরবদের বহু সৈন্য ধ্বংস হোল। দুর্যোধন খুব চিন্তায় পড়লেন। তিনি দ্রোণকে বললেন, 'এইভাবে যদি কুরুসৈন্য ধ্বংস হয় তাহলে কেউই বেঁচে থাকবে না। তার থেকে এক কাজ করা যাক। আপনি যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনুন। যুধিষ্ঠির ধরা পড়লেই পাণ্ডবরা হার মানবে!'

একথা শুনে দ্রোণ বললেন, 'আমি আগেই বলেছি যুধিষ্ঠির যতক্ষণ অর্জুনের কাছে আছেন ততক্ষণ তাঁকে ধরে আনা যাবে না। অর্জুনকে যদি কিছুক্ষণের জন্যও যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলেই তাকে আমি বন্দী করে আনবো।'

তখন ঠিক করা হোল, কৃষ্ণ দুর্যোধনকে যে দশ লক্ষ নারায়ণী সেনা দিয়েছিলেন তাদের দিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তরদিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ওই নারায়ণী সেনা দিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখতে পারলেই কাজের সুবিধা হবে।

অর্জুন উত্তরদিকে যুদ্ধ করছেন। এদিকে দ্রোণাচার্য এমন এক চক্রব্যূহ রচনা করলেন যা অর্জুন ছাড়া আর কেউ ভেদ করতে পারবে না। একমাত্র অর্জুনপুত্র অভিমন্যু বাবার কাছে ব্যূহ ভেদ করার কৌশল শিখেছিলেন, কিন্তু বের হওয়ার কৌশল তখনও শেখেননি। ভীম, নকুল, সহদেব সকলে তাকে বললেন, 'তুমি ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়, আমরা ব্যূহ ভেঙে দেব।'

বালক অভিমন্যু এই কথা শুনে ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু আর কোনো পাণ্ডব বীরই তার মধ্যে ঢুকতে পারলেন না। অভিমন্যু ব্যূহ থেকে বের হবার কৌশল জানতেন না। তবুও একাই তিনি এমন যুদ্ধ শুরু করলেন যে, কৌরবদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

তখন উপায় না দেখে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, জয়দ্রথ এই সাত রথী অন্যায়ভাবে বালক অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। তারপর সেই সুযোগে দুঃশাসনের ছেলে অভিমন্যুকে গদার আঘাতে হত্যা করলো।

নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত দেহে শিবিরে ফিরেই অর্জুন শুনতে পেলেন সাত রথীর অন্যায়ভাবে অভিমন্যুকে হত্যার কথা। জয়দ্রথ ব্যূহমুখ আটকে রেখে কাউকে ব্যূহে ঢুকতে দেয়নি শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, কাল সূর্যাস্তের আগেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করতে না পারলে নিজেই আগুনে পুড়ে মরবেন।

পরদিন চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে দোণাচার্য বারো ক্রোশ লম্বা এমন এক ব্যূহ রচনা করে জয়দ্রথকে আটকে রাখলেন যে, তাকে মারা অর্জুনের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠলো। ওদিকে বেলা শেষ হয়ে আসছে। জয়দ্রথকে বধ না করতে পারলে অর্জুন আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করবেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সূর্যকে আচ্ছাদন করে দিলেন। অন্ধকার হয়ে যেতেই আনন্দে জয়দ্রথ ব্যূহ থেকে বেরিয়ে এলো। অমনি কৃষ্ণের আদেশে অর্জুন তার মাথা কেটে ফেললেন। আর, সুদর্শন চক্র সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য আবার জেগে উঠলো। এদিকে লক্ষ লক্ষ কৌরবসেনাও মারা গেছে, রেগে দুর্যোধন আদেশ দিলেন, 'আজ সারা রাত যুদ্ধ চলবে।'

সেইজন্যে মশাল জ্বালিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এবার যুদ্ধ করতে এলেন ভীম আর হিড়িম্বার ছেলে ঘটোৎকচ। তাঁরা এমন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে মনে হোল, রাত শেষ হবার আগেই সব কৌরবসেনা শেষ হয়ে যাবে। উপায় না দেখে কর্ণ যে একাঘ্নী বাণ অর্জুনকে মারবার জন্যে রেখেছিলেন সেটি ঘটোৎকচের ওপর নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচ মারা গেল। এমনিভাবেই সেদিনের নিশাযুদ্ধ শেষ হলো।

পরের দিন পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধ। দ্রোণ সেদিন এমন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে পাণ্ডবরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। সকলে ভাবতে লাগলেন কিভাবে দ্রোণকে বধ করা যায়। দ্রোণকে না মারতে পারলে পাণ্ডবদের

জয়লাভ করার আর আশা নেই। তখন তাঁরা একটা মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। দুর্যোধনের প্রিয় হাতি অশ্বত্থামা মারা গেল। যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রথমে চীৎকার করে বললেন, 'অশ্বত্থামা মারা গেছে।' তারপর খুব আস্তে বললেন, 'সেটা একটা হাতি।' দ্রোণ শুধু প্রথমটুকু শুনেই ভাবলেন, তাঁর বীর পুত্র অশ্বত্থামা মারা গেছেন। মহাধার্মিক যুধিষ্ঠিরের মুখে একথা শুনে শোকে তিনি রথের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর ঠিক সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন এক লাফে রথের ওপর উঠে তাঁর মাথাটা কেটে ফেললেন।

পাণ্ডবরা তো খুব খুশী। দ্রোণের মৃত্যুর পর সেদিনের যুদ্ধ শেষ হোল।

কর্ণপর্ব

ষোড়শ দিনের যুদ্ধে কৌরবদের সেনাপতি হলেন মহাবীর কর্ণ। তিনি অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য বধ করলেন। নকুলকে বন্দী করলেন। সেই সময় শল্য কুন্তীর কাছে কর্ণের প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে করিয়ে দিলেন—অর্জুন ছাড়া আর কাউকে কর্ণ বধ করবেন না। কথাটা শল্য মনে করিয়ে দিতে নকুলকে ছেড়ে দিলেন কর্ণ। পাণ্ডবদের পক্ষে অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীম অনেক কৌরবসৈন্য মেরে ফেললেন। এইভাবে সেদিনের মতো যুদ্ধ শেষ হোল।

সপ্তদশ দিনের যুদ্ধে সকাল থেকেই ভীম নিজমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি হাতিকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে হাতি উল্টে পড়ে, রথসুদ্ধ রথীকে তিনি আছড়ে তালগোল পাকিয়ে দিতে লাগলেন। সেদিন কেউ আর তাঁর সামনে এগোতে সাহস পায় না।

এমন সময় দুঃশাসন এলেন ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ভীষণ যু শুরু হোল। দেখে মনে হোল, যেন দু'টো পাগলা হাতি লড়াই করছে এক সময় দু'জনের গদার আঘাতে দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ

ফিরতেই ভীম গদার আঘাতে দুঃশাসনকে মেরে ফেললেন। তারপর নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়তেই দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করলেন ভীম। কৌরবসৈন্যরা সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে পালাতে আরম্ভ করলো।

এই সময় অর্জুন এলেন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধক্ষেত্রে বড় বড় বীর অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন সেই ভয়ংকর যুদ্ধ। কর্ণ এমন সব অস্ত্র ছুঁড়তে লাগলেন যা কেউ কখনো দেখেননি। অর্জুনও আবার সেই সব অস্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্য সমান ভয়ংকর অস্ত্র ছুঁড়তে লাগলেন।

এমনিভাবে যুদ্ধ চলতে চলতে কর্ণের চাকা মাটিতে বসে গেল। রথ আর নড়ে না। এখন উপায়? কিভাবে তিনি যুদ্ধ করবেন? হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার সেই ব্রহ্মশাপের কথা। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পরশুরামের শিষ্য হয়ে তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন। যেদিন চিনতে পারলেন সেদিন দিলেন তীব্র অভিশাপ। বললেন, 'মৃত্যুকালে এই অস্ত্রের কথা তুমি ভুলে যাবে, রথের চাকা বসে যাবে মাটিতে।' আজ সেই সময় এসে গেছে। কর্ণ সব বুঝলেন। কিন্তু তবুও শেষবারের মতো সময় চাইলেন। বললেন, চাকাটা তুলি, তারপর যুদ্ধ কর। অর্জুন তখন ক্ষেপে গেছেন। বললেন, 'অভিমন্যুকে যখন বধ করেছিলে তখন যুদ্ধের নিয়ম কোথায় ছিল?

কৃষ্ণের ইঙ্গিতে কর্ণকে লক্ষ্য করে মহাস্ত্র ছুঁড়লেন অর্জুন। ব্রহ্মশাপে তখন কর্ণ ভুলে গেছেন ব্রহ্মাস্ত্রের কথা। আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। দিনের শেষে সূর্য চলেছেন অস্তাচলে। অর্জুনের শরে মহাবীর কর্ণের মস্তক লুটিয়ে পড়লো মাটির ওপর।

কর্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের যুদ্ধও শেষ হয়ে গেল।

শল্যপর্ব

আজ আঠারো দিনের যুদ্ধ। মহাবীর শল্য হয়েছেন কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি। বহু বড় বড় বীর যুদ্ধে মারা গেছেন। সেই কারণেই কৌরব

এবং পাণ্ডব উভয়পক্ষই যুদ্ধজয়ের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু শল্যও শেষরক্ষা করতে পারলেন না। যুধিষ্ঠির শল্যের দিকে এমন শেল নিক্ষেপ করলেন, যার আঘাতে শল্য মৃত্যুবরণ করলেন।

শল্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু করলেন মাতুল শকুনি। সহদেব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে হাতে শকুনি পাশা খেলেছিলেন সেই হাতখানি তিনি কেটে দেবেন। সেইজন্যে প্রতিজ্ঞামত প্রথমে তিনি শকুনির ডান হাত কেটে দিলেন। তারপর তার মাথা কেটে তাকে মেরে ফেললেন।

আঠারো দিনের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে বেঁচে আছেন অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা। তাঁদের এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে আর বেঁচে আছে অল্প কয়েকজন মাত্র। যুদ্ধক্ষেত্রের এইরকম অবস্থা দেখে দুর্যোধন কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে পালিয়ে গেলেন। পথে দেখা হোল সঞ্জয়ের সঙ্গে। তিনি তাঁর পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর পরাজয় এবং দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে থাকার কথা জানাতে বললেন। তারপর গদা নিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন।

পথে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হোল কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামার সঙ্গে। তাঁদেরও তিনি দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে থাকার সংবাদ দিলেন। তারপর হস্তিনার দিকে যাত্রা করলেন। সঞ্জয়ের মুখে খবর পেয়ে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামাও দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়ে হাজির হলেন। শল্যের মৃত্যুর পরই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হলো।

গদাপর্ব

পাণ্ডবরা চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুর্যোধনকে। যুদ্ধ জয় হলো, কিন্তু দুর্যোধন কোথায়? এদিকে সঞ্জয়ের কাছ থেকে দুর্যোধনের হ্রদে লুকিয়ে থাকার কথা জানতে পেরে অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, আর কৃপাচার্য দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে এসে দুর্যোধনকে ডাকতে লাগলেন। তাঁরা বললেন,

'আপনি উঠে আসুন, পাণ্ডবদের অবশিষ্ট সৈন্য যা আছে তা আমরাই বধ করে ফেলবো।' তখন দুর্যোধন হ্রদের মধ্য থেকে বললেন, 'আজ আমি বড় ক্লান্ত। আজকে রাতটা বিশ্রাম করি। কাল সকালে আবার আসুন, সকলে মিলে যুদ্ধ করবো।'

যখন তাঁরা কথাবার্তা বলছিলেন তখন একজন ব্যাধ সমস্ত কথা শুনে পাণ্ডবদের খবর দিল। খবর পেয়েই কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবরা এসে হাজির হলেন দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে। কিন্তু দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে এসেও তাঁরা দুর্যোধনের কোনো সাড়া পেলেন না। তীরে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির তখন তীব্র ভাষায় দুর্যোধনকে তিরস্কার করতে লাগলেন। এইরকম তিরস্কার সহ্য করা দুর্যোধনের অভ্যাস নেই। গদা হাতে জলের ভেতর থেকে তিনি উঠে এলেন। বললেন, 'যুদ্ধ থেকে আমি পালিয়ে আসিনি। আজ আমি বড় ক্লান্ত। কাল তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।'

কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন, 'আজকেই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যাক।' ঠিক হোল ভীমের সঙ্গে দুর্যোধন গদাযুদ্ধ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গদাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর পাণ্ডবেরা চার ভাই এই ভয়ংকর যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। দু'জনেই সমান যোদ্ধা। কেউ কাউকে হারাতে পারেন না। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন নিজ ঊরুতে আঘাত করে ভীমকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলেন। বলরাম তাঁদের গদাযুদ্ধের গুরু। তিনি সামনেই বসে আছেন। এমন সময় দুর্যোধন ভীমের মাথায় গদা মারবার জন্যে লাফ দিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভীমও গদার আঘাত করলেন দুর্যোধনের ঊরুতে। ঊরুভঙ্গ হয়ে দুর্যোধন লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

গদাযুদ্ধে নাভির নীচে আঘাত করা নিয়ম-বিরুদ্ধ। তার ওপর আবার দুর্যোধন যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ভীম তখন তাঁর মুখে লাথি মারতে লাগলেন। এত বড় অন্যায় বলরাম সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পাণ্ডবদের ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় শান্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে বলরাম দ্বারকায় ফিরে গেলেন। শুধু ভগ্নঊরু দুর্যোধন একাকী সেই দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে মাটিতে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সৌপ্তিকপর্ব

দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উরুভঙ্গ হয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত গুনছেন। এমন সময় অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অশ্বত্থামা এসে প্রথমেই বললেন, 'দেখ দুর্যোধন, তুমি এতকাল যাদের সেনাপতি করেছিলে তাঁরা সকলেই পাণ্ডবদের স্নেহ করতেন। আমাকে সেনাপতি কর, আমি পাণ্ডবদের বধ করে ফেলবো।' দুর্যোধন এই কথা শোনামাত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করে দিলেন।

তারপর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা গেলেন পাণ্ডব-শিবিরে। তখন রাত্রির অন্ধকার। অশ্বত্থামা বললেন, 'এখন রাতের অন্ধকারে পাণ্ডবরা ঘুমিয়ে আছেন, তাঁদের বধ করার এইটাই সব থেকে ভাল সুযোগ।' কৃপাচার্য বললেন, ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করা মহাপাপ, এ রকম পাপ কাজ করো না।' কিন্তু অশ্বত্থামা সেকথা না শুনে পাণ্ডব-শিবিরে ঢুকে পড়লেন। কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে। কেউ বের হবার চেষ্টা করলেই তাঁরা তাঁদের বধ করবেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে হত্যা করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর ওপর অশ্বত্থামার রাগ ছিল সব থেকে বেশী। প্রথমেই তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করলেন। তারপর বধ করলেন শিখণ্ডীকে। এরপর ঘুমন্ত পাণ্ডব সৈন্যদের পশুর মতো বধ করতে লাগলেন অশ্বত্থামা। যাঁরা পালাবার চেষ্টা করলেন তাঁরা কৃপাচার্য আর কৃতবর্মার হাতে নিহত হলেন।

একটা ঘরে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ঘুমোচ্ছিল। অশ্বত্থামা অন্ধকারে তাদের পঞ্চপাণ্ডব বলে ভুল করে গলা কেটে ফেললেন। তারপর সেই পাঁচটি মুণ্ড নিয়ে ছুটলেন দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধন তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মর-মর অবস্থা তাঁর। কিন্তু অশ্বত্থামা যখন এসে বললেন, আমি পঞ্চ-পাণ্ডবকে বধ করে তাদের মুণ্ড নিয়ে এসেছি, তখন আনন্দে হাতে ভর দিয়ে বহুকষ্টে উঠে বসলেন। বললেন, 'কই দাও দাও, মুণ্ড ক'টা দাও।' ভীমের ওপর ছিল দুর্যোধনের ভীষণ রাগ। তিনি পাঁচটি মুণ্ড নিয়ে প্রথমে

ভীমের মুণ্ডটা মাটিতে রেখে জোর চাপ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেল। দুর্যোধন অবাক হলেন। যে মুণ্ড কোনোদিন গাছ আর গদাতে গুঁড়ো হয়নি তা সামান্য হাতের চাপে কি করে গুঁড়ো হয়ে গেল! এ অসম্ভব! ভীমের মাথা এ কিছুতেই হতে পারে না। ভালো করে সেগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন, হায় হায়! অশ্বথামা, তুমি এ কি করেছো! পঞ্চপাণ্ডবকে মারবার সাধ্য কারো নেই। দ্রৌপদীর পাঁচটি অসহায় ছেলেকে হত্যা করে কি উপকার করলে বল? তুমি কুরুবংশ একেবারে নির্বংশ করে দিলে? আমাদের যে জলপিণ্ড দেবারও কেউ রইলো না।

দুর্যোধন হায় হায় করতে করতে মারা গেলেন। কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা তখন পাণ্ডবদের ভয়ে পালিয়ে গেলেন। কেবল অশ্বথামা বললেন, আমার কাছে ব্রহ্মাস্ত্র আছে, তাই দিয়েই আমি পাণ্ডবদের বধ করবো।

ঐষিকপর্ব

রাতের অন্ধকারে পাণ্ডবশিবিরে যখন অশ্বথামা ঘুমন্ত সৈন্য ও সেনাপতিদের হত্যা করছিলেন তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি মৃতের স্তূপের মধ্যে মরার ভান করে পড়েছিলেন। ভোর হতে-না-হতেই তিনি পাণ্ডবদের এই দুঃসংবাদ দিলেন। রাগে শোকে পাণ্ডবরা অধীর হয়ে পড়লেন। দ্রৌপদী বললেন, অশ্বত্থামার মাথা কেটে মণিটা আমাকে এনে দিতে হবে। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম ছুটলেন অশ্বত্থামাকে বধ করতে। সঙ্গে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন। অশ্বথামা তখন ভয় পেয়ে পালাচ্ছিলেন, কিন্তু ভীম তাঁকে ধরে এমন গর্জন করতে লাগলেন যে, ভয় পেয়ে অশ্বথামা একটা ঈষিকা অর্থাৎ কাশ ঘাস তুলে নিয়ে মন্ত্র পড়ে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এই অস্ত্রে পৃথিবী পাণ্ডবহীন হোক।

ভয়ংকর অস্ত্র এই ঈষিকা। এই অস্ত্র কখনো ব্যর্থ হয় না। এমন সময় সেখানে কৃষ্ণ আর অর্জুন এসে হাজির হলেন। ঈষিকা অস্ত্র থেকে প্রাণ

বাঁচাবার জন্যে অর্জুন সংবরণ অস্ত্র ছাড়লেন। দুই অস্ত্র তখন আকাশে উঠে দারুণ অগ্নিবৃষ্টি করতে লাগল। পৃথিবী ধ্বংস হবার উপক্রম হোল। নারদ আর ব্যাসদেব এই ভয়ংকর ব্যাপার দেখে দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, নিজেদের মধ্যে তোমাদের বিবাদ, কিন্তু তার জন্যে পৃথিবী ধ্বংস করবার অধিকার তোমাদের নেই। তোমাদের এই ভয়ংকর অস্ত্র ফেরাও। অর্জুন তাড়াতাড়ি অস্ত্র সংবরণ করলেন কিন্তু অশ্বত্থামা অস্ত্র সংবরণ করতে জানতেন না। তিনি বললেন, আমি অস্ত্র সংবরণ করতে জানি না। আমার ঈষিকা অস্ত্র উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর যে ছেলে আছে তাকেই বধ করুক। সঙ্গে সঙ্গে তাই ঘটলো। অস্ত্র ছেলেটিকে বধ করলো কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আবার তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। ব্যাসদেব সেই সময় অশ্বত্থামাকে তার কৃতকর্মের জন্য তার মাথার মণিটি কেটে দিতে বললেন। ব্যাসদেবের কথামত মণিটি কেটে দিয়ে অশ্বত্থামা যন্ত্রণায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরতে লাগলেন। দ্রৌপদী অশ্বত্থামার মাথার মণি পেয়ে কিছুটা শান্ত হলেন। তারপর সেই মণিটি দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কথা রাখতে সেই মণিটি নিজের মাথার মুকুটে পরলেন।

স্ত্রীপর্ব

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। মারা গেছেন একশত কৌরব ভাই। ধ্বংস হয়েছে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য। কৌরবপক্ষে কেবলমাত্র বেঁচে আছেন অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা। পান্ডবরা জয়লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষেও বেঁচে আছেন মাত্র পাঁচ ভাই, শ্রীকৃষ্ণ আর সাত্যকি—এই সাতজন।

ব্যাসদেব এসে শোকে কাতর ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক বুঝিয়ে কুরুক্ষেত্রে পাঠালেন। কারণ, মৃতদেহগুলো সৎকার করতে হবে। বধূদের নিয়ে গান্ধারীও চললেন। কুরুক্ষেত্রেও এখন ভয়ংকর রূপ। চতুর্দিকে

পড়ে আছে মৃতদেহ। চারিদিকে হাহাকার। সেই ভয়ানক দৃশ্যের মাঝখানে পাণ্ডবরা এলেন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে। ধৃতরাষ্ট্র স্নেহভরে ভীমকে আলিঙ্গন করতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগে থেকেই অনুমান করে একটা লোহার ভীম তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটিকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এগিয়ে দিলেন। পুত্রশোকে অধীর ধৃতরাষ্ট্র সেটি এমন জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, লোহার ভীম গুঁড়ো হয়ে গেল। ভীম এগিয়ে গেলে ধৃতরাষ্ট্রের হাতে তাঁর মৃত্যু হোত অবধারিত।

পাণ্ডবরা ভেবেছিলেন, গান্ধারী তাঁদের অভিশাপ দেবেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা। ধর্মের জয় হয়েছে ভেবে তিনি পাণ্ডবদের ক্ষমা করলেন। তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্যে তিনি একমাত্র কৃষ্ণকেই দায়ী করলেন এবং অভিশাপ দিলেন, কুরু-পাণ্ডবের বিবাদের মধ্যে যেমন কুরুকুল ধ্বংস হয়েছে তেমনিভাবে যদুবংশও একদিন ধ্বংস হবে।

এবার যুধিষ্ঠির এলেন হস্তিনাপুরে। একটা শুভদিন দেখে তাঁর রাজ্যাভিষেক হোল। দেশে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোল। ধার্মিক পাণ্ডবরা রাজা হওয়ায় সারা রাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। প্রজারা খুব সুখে এবং শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলো।

শান্তিপর্ব

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছেন। সারা দেশে শান্তি বিরাজ করছে। তবুও যুধিষ্ঠিরের মনে একবিন্দু শান্তি নেই। সামান্য রাজ্যের জন্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে, বধ করেছেন এমন কি গুরু দ্রোণাচার্য ও পিতামহকেও বধ করতে হয়েছে। সকলেই তাঁকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু কিছুতেই যুধিষ্ঠির প্রবোধ মানলেন না। তখন ঠিক করলেন, তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করবেন। এমন সময় ব্যাসদেব এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তুমি গিয়ে ভীষ্মের কাছে উপদেশ নাও, শান্তিলাভ

করবে। পিতামহ ভীষ্ম তখনো শরশয্যায় শুয়েছিলেন। তিনি একদিকে যেমন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন তেমনি ছিলেন সে যুগের সব থেকে জ্ঞানী এবং ধার্মিক মানুষ। তিনি উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করছেন। তারপর তিনি দেহত্যাগ করবেন।

একদিন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, চার ভাই ও মাকে নিয়ে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। ভীষ্ম আনন্দিত মনে যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নানারকম উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠির-এর মনে শান্তি ফিরে এলো। এদিকে সূর্য উত্তরায়ণে গমন করেছেন। পিতামহ ভীষ্ম সেই উত্তরায়ণের সময় মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে দেহত্যাগ করলেন। ভীষ্ম দেহত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই শোকে অধীর হয়ে পড়লেন। তারপর যুধিষ্ঠির তাঁর সৎকার করলেন। শ্রাদ্ধতর্পণাদি করে তিনি দু'হাতে ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্রদের ধন দান করলেন। ভীষ্মকে হারিয়ে সকলে বুঝতে পারলেন, তাঁর মতো সত্যবাদী, ত্যাগী আর কর্তব্যপরায়ণ মানুষের অভাব আর কোনোদিন পূরণ হবে না।

অশ্বমেধপর্ব

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গুরুজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। একদিন একটি ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তার গায়ে ফলকে লেখা ছিল— 'এটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। যদি কারো ক্ষমতা থাকে সে যেন এটি আটক করে।' ঘোড়াটি যখন চলতে লাগলো তখন ভীম, অর্জুন প্রভৃতি বীরেরা তার রক্ষক হয়ে চললেন। ঘোড়া ফিরে এলে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ শুরু করবেন। ঘোড়াটি চলতে চলতে নীলধ্বজ রাজার রাজ্যে গিয়ে হাজির হোল। নীলধ্বজপুত্র প্রবীর ঘোড়াটি আটক করলো। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের সঙ্গে প্রবীরের ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল, যুদ্ধে প্রবীর

মারা গেল। পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নীলধ্বজ অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

শোকে দুঃখে ঘৃণায় প্রবীরের মাতা জনা গঙ্গাজলে ডুবে জীবন বিসর্জন দিলেন। জনা এইভাবে মৃত্যুবরণ করায় গঙ্গাদেবী অর্জুনকে অভিশাপ দিলেন যে, সে নিজের পুত্রের হাতেই মৃত্যুবরণ করবে। এরপর ঘোড়া ছুটতে লাগলো বহু রাজ্য পেরিয়ে আরো বহুদূরে। বেশির ভাগ রাজাই নানারকম ধনসম্পদ রত্নরাজি দিয়ে অর্জুনের বশ্যতা স্বীকার করলেন। এইভাবে ঘোড়াটি চলতে চলতে হাজির হোল মণিপুর রাজ্যে। অর্জুন বহু আগে একবার এই মণিপুরে এসেছিলেন। সেখানকার রাজ-কন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সেই চিত্রাঙ্গদার ছেলে বভ্রুবাহন এখন মণিপুরের রাজা।

পাণ্ডবদের যজ্ঞ-অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বভ্রুবাহন ঘোড়াটিকে ধরে ফেললেন। এর ফলে অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধ বেধে গেল। ভয়ংকর যুদ্ধ। যুদ্ধে পাণ্ডবসৈন্যরা হেরে গেল এবং অর্জুন বভ্রুবাহনের হাতে নিহত হলেন। গঙ্গার অভিশাপ এইভাবে ফললো। কিন্তু অর্জুনের স্ত্রী নাগকন্যা উলুপী অমৃতমণি ছুঁইয়ে আবার অর্জুনকে বাঁচিয়ে দিলেন। অর্জুন বেঁচে উঠে বভ্রুবাহনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। এরপর বভ্রুবাহনও চললেন অর্জুনের সঙ্গে পাণ্ডবদের ঘোড়া রক্ষা করতে। পথে যেতে যেতে শিখধ্বজ রাজার পুত্র তাম্রধ্বজের সঙ্গেও পাণ্ডবদের ভীষণ যুদ্ধ হোল। এইভাবে দিগ্বিজয় শেষ হোল। দিগ্বিজয় সমাপ্ত করে পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। তারপর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি ফিরে এলো। ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হোল।

আশ্রমিকপর্ব

ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীকে পাণ্ডবরা নিজের বাপ-মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন।

সেবা ও যত্নে তাঁরা সর্বদাই তাঁদের সন্তুষ্ট রাখতেন। তাঁদের কথামতো চলতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এইভাবে পনেরো বছর কেটে গেল। ধৃতরাষ্ট্র আর সংসারে থাকতে চাইলেন না। তাঁর ইচ্ছা এবার বনে গিয়ে তপস্যা করবেন। সেইজন্যে ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন যুধিষ্ঠির। একদিন শুভদিন দেখে গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয়কে নিয়ে বনে চলে গেলেন ধৃতরাষ্ট্র। সেখানে তপস্যায় তাঁরা জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাতে লাগলেন।

কিছুদিন পর পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই সেই বনে গেলেন তাঁদের দেখবার জন্যে। সেখানে গিয়ে শুনলেন, গঙ্গার তীরে বিদুর উপবাস করে দেহত্যাগ করেছেন। পাণ্ডবরা সেখানে গিয়ে তাঁর সৎকার করলেন। তারপর শ্রাদ্ধাদি কার্য সেরে আবার হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

দিন কেটে যাচ্ছে। বিদুরের মৃত্যুর পর আরো অনেক কাল কেটে গেল। হঠাৎ একদিন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় এসে হাজির নারদমুনি। ভীষণ দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন তিনি। ধৃতরাষ্ট্র একদিন যজ্ঞ করার পর আগুন নেভাতে ভুলে গিয়েছিলেন। দেখতে দেখতে সেই আগুন সারা বনে ছড়িয়ে পড়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে সমস্ত বনভূমি। সেই আগুনে পুড়ে মারা গেছেন, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তী। এই ভয়ানক দুঃসংবাদ শুনে পাণ্ডবরা হায় হায় করে উঠলেন। সারা রাজ্যে শোক ছড়িয়ে পড়লো। তারপর তাদের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করলেন যুধিষ্ঠির। মুনি, ঋষি আর ব্রাহ্মণদের অনেক ধনরত্ন দান করলেন।

মুষলপর্ব

পৃথিবীর পাপ-তাপ বিনাশ করবার জন্যে জন্ম হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামের। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তা প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এত বীর কুরুক্ষেত্রে মারা গেছেন, কিন্তু যদুবংশের কোনো ক্ষতিই হয়নি! এইবার যদুবংশের পালা। কিন্তু এত বড় বংশ, এত লোক, কে তাদের ধ্বংস

করবে? প্রবল প্রতাপ তাঁদের। কাউকেই তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। একদিন যদুবংশের ছেলেরা একটা মুষল নিয়ে ব্রাহ্মণদের খুব উপহাস করলো। তখন ব্রাহ্মণরা রেগে গিয়ে তাদের অভিশাপ দিলেন—এই মুষল থেকেই যদুবংশ সমূলে ধ্বংস হবে।

তখন যদুবংশের ছেলেরা ভীষণ ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে সেই পাপের কথা জানালো! শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমরা প্রভাসের তীরে মুষলটাকে পাথরে ঘষে ঘষে ক্ষয় করে ফেল। তাহলেই আর মুষল থেকে কোনো ভয়ের কারণ ঘটবে না। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমতো ছেলেরা প্রভাসের তীরে মুষলটাকে ঘষে ক্ষয় করে ছোট্ট টুকরাটাকে ফেলে দিল। জরা নামে একজন ব্যাধ টুকরাটাকে কুড়িয়ে নিয়ে একটা বাণ তৈরি করলো। আর মুষলটা যেখানে ঘষা হয়েছিল সেখানে জন্মালো একটা বিরাট নলখাগড়ার বন। শ্রীকৃষ্ণ একদিন যদুবংশের সকলকে সঙ্গে নিয়ে প্রভাস তীর্থে স্নান করতে গেলেন। কথায় কথায় সেখানে নিজেদের মধ্যে তাঁরা ঝগড়া বাধিয়ে ফেললেন। ঝগড়া থেকে শুরু হোল প্রচণ্ড যুদ্ধ। অস্ত্র নিয়ে প্রথমে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তারপর অস্ত্র ফুরিয়ে যেতে নলখাগড়া তুলে নিয়ে তাঁরা মারামারি আরম্ভ করলেন। এক-একটা নলখাগড়ার আঘাত লাগে আর এক-একজন বীর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দেখতে দেখতে বিরাট যদুবংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। বেঁচে রইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রহস্ত। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণও জরাব্যাধের বাণে প্রাণ হারালেন। তারপর যোগে বসে বলরামও দেহত্যাগ করলেন।

স্বর্গারোহণপর্ব

শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক এসে যদুবংশ ধ্বংসের কথা পাণ্ডবদের জানালেন। অর্জুন তখনই ছুটলেন দ্বারকায়। তারপর প্রভাস তীর্থে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সৎকার করে তিনি ফিরে এলেন হস্তিনায়। পথে ব্যাসদেবের সঙ্গে দেখা হোল অর্জুনের। তিনি অর্জুনকে বললেন, তোমাদের কাজ শেষ হয়ে

গেছে, দ্বাপর শেষ হয়ে কলিযুগ আসছে। আর দেরি করো না। এবার তোমরা মহাপ্রস্থানে যাত্রা করো। যুধিষ্ঠির অর্জুনের কাছ থেকে ব্যাসদেবের কথা শুনে মহাপ্রস্থানে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তার আগে অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষিৎকে হস্তিনায় আর শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রহস্তকে দিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার। অগ্নিদেবের কাছ থেকে খাণ্ডবদাহনের সময় গাণ্ডীব ধনু আর অক্ষয় তূণ পেয়েছিলেন অর্জুন। এই সময় অগ্নিদেব এসে সেগুলি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর পাণ্ডবরা সশরীরে স্বর্গে রওনা হলেন।

পাণ্ডবরা হিমালয়ের ওপর দিয়ে বহু দুর্গম পথ পার হয়ে স্বর্গের পথে চলেছেন। বরফে বরফে চারিদিকে ঢাকা। পথে নিদারুণ কষ্ট। দ্রৌপদী আর পথের কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। ভদ্রকালী পর্বতের ওপর তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে দ্রৌপদী অর্জুনকে বেশী ভালবাসতেন, সেইজন্য তিনি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেন না। আরো এগিয়ে চললেন পাণ্ডবরা। একটা কুকুর চলেছে আগে আগে। সহদেব দেহত্যাগ করলেন বদরিকাশ্রম পার হয়ে। চন্দ্রকালী পর্বতে দেহত্যাগ করলেন নকুল। আর নন্দিঘোষ পর্বতে দেহত্যাগ করলেন অর্জুন। ভীম এঁদের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব অতীত ভবিষ্যৎ সব জানতেন; তবু আগে জেনেও তিনি জতুগৃহদাহের কথা, পাশা খেলায় হারার কথা জানাননি। নকুলের ছিল রূপের গর্ব আর অর্জুনের ছিল বীরত্বের গর্ব। সেইজন্য তাঁদের মৃত্যু হলো।

সোমেশ্বর পর্বতে উঠতে উঠতে ভীমের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। মৃত্যুর আগে ভীম জিজ্ঞেস করলেন যুধিষ্ঠিরকে, আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো কেন? আমি কি দোষ করেছি? যুধিষ্ঠির বললেন, অতিরিক্ত খাওয়ার লোভেই তোমার মৃত্যুর কারণ। সকলেই পথের মাঝে দেহত্যাগ করলেন। এখন যুধিষ্ঠির একাই চলেছেন। সঙ্গে আছে সেই কুকুরটি। স্বর্গের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, আপনার মতো

ধার্মিকই সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু এই কুকুরটাকে তো যেতে দেওয়া যাবে না। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, প্রভু বহু কষ্ট করে কুকুরটা আমার সঙ্গে এসেছে। আমার যে পুণ্য আছে তার অর্ধেক নিয়ে ওকেও আপনি স্বর্গে ঢুকতে দিন। যুধিষ্ঠির এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের রূপ ত্যাগ করে নিজমূর্তি ধারণ করে যুধিষ্ঠিরের খুব প্রশংসা করতে লাগলেন ধর্ম। এর পর ইন্দ্রের রথে চড়ে যুধিষ্ঠির স্বর্গে হাজির হলেন। কিন্তু তিনি দ্রৌপদী বা ভাইদের কাউকেই সেখানে দেখতে পেলেন না। যুধিষ্ঠির তখন বৈকুণ্ঠে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার আত্মীয়-স্বজন, দ্রৌপদী এবং ভাইয়েরা সব কোথায় আছেন? শ্রীকৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে নরকে পাঠালেন!

যুধিষ্ঠির তো নরক দেখেই কেঁপে উঠলেন। ভীষণ অন্ধকার চারিদিকে। বড় বড় আগুনের কুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে। এখানে তিনি চার ভাই, দ্রৌপদী এবং আত্মীয়-স্বজনদের সকলকেই দেখতে পেলেন। যুধিষ্ঠিরের পুণ্যে তাঁরা এবার সকলেই স্বর্গের পথে যাত্রা করলেন। যুধিষ্ঠির সেই সময় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে নরক দর্শন করতে হোল কেন? আমি তো কোনো পাপ করিনি। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তুমি দ্রোণাচার্যকে খুব জোরে বলেছিলে 'অশ্বত্থামা হত' আর এমন আস্তে বলেছিলে 'ইতি গজ' যে তিনি শুনতে পাননি। তোমার এইভাবে বলার ফলে তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা মারা গেছেন। এইখানেই মিথ্যা বলার পাপ হয়েছিল তোমার। এই মিথ্যা কথাটুকু বলার জন্যেই তোমাকে একটি বারের জন্য নরক দেখতে হোল। এবার যুধিষ্ঠির চার ভাই, দ্রৌপদী আর নিজের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করতে লাগলেন।

মহাভারতের কথা অমৃতের সমান। যে শোনে সে পুণ্যলাভ করে। সেই পুণ্যকাহিনী এখানেই শেষ হোল।

॥ সমাপ্ত ॥